মানব মন

প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা
জানুয়ারী ১৯৬২

এ সংখ্যায় লিখেছেন

আই. পি. পাভলভ
ডাঃ রুদ্রেন্দ্র কুমার পাল
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
ডক্টর অরুণা হালদার
তরুণ চট্টোপাধ্যায়
ডাঃ সন্তোষ দাস
প্রমোদ সেনগুপ্ত
ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
ইত্যাদি

মনোবিজ্ঞান - জীববিজ্ঞান - সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক ধারা পরিচায়ক ত্রৈমাসিক পত্র

नमोदनाथ

মানবমন
১ম খণ্ড ; ১ম সংখ্যা
জানুয়ারী ১৯৬২

সূচীপত্র

১।	পাভলভ গবেষণাগারে দুইদিন	—ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল	১
২।	পাভলভ পরিচিতি (৩)	—ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৯
৩।	আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থায় ফ্রয়েডবাদ ও প্রয়োগবাদ	—শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত	১৫
৪।	মনরোগের কারণ নির্ণয় (২)	—মনোবিদ	২১
৫।	জনাতঙ্ক	—অধ্যাপিকা অমিয়া গঙ্গোপাধ্যায়	২৬
৬।	মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে	—এম, ইয়ানোফস্কায়া	৩২
৭।	মানসিক শ্রমের বৈপ্লবিক রূপান্তর	—শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়	৩৬
৮।	প্রক্ষোভ	—দোসেন্ত, পে, এম, ইয়াকবসন	৪০
৯।	শিল্পধর্মী ও চিন্তাধর্মী মস্তিষ্ক সম্পর্কে	—আই, পি, পাভলভ	৪৬
১০।	মনের কথা (২)	—অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৪৯
১১।	জীব ও জীবাণু	—ডাঃ সন্তোষ কুমার দাশ	৫১
১২।	পুস্তক পরিচয়	—ডাঃ অরুণা হালদার	৫৪
	সম্পাদকীয়		৫৬

সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
শ্রীগোপাল হালদার
ডাঃ সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ডক্টর জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
ডাঃ অজিত দেব
ডক্টর অরুণা হালদার
ডাঃ বিনয় ভট্টাচর্য
ডাঃ সন্তোষ দাস
ডাঃ সন্তোষ বোস
শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়
ডাঃ জ্যোতির্ম্ময় শর্ম্মা •
ডাঃ সোমনাথ মুখার্জ্জি •

****
মুদ্রণপ্রমাদে
পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫,৬,৭,৮,
বাদ গেছে
****
****

১। পত্রিকার নাম—মানব-মন

২। যে ভাষায় প্রকাশিত হয়—বাংলা

৩। প্রকাশকের কাল—(ত্রৈমাসিক, ১৫ই জানুয়ারী, ১৫ই এপ্রিল, ১৫ই জুলাই, ১৫ই অক্টোবর)

৪। দাম—১·০০ প্রতি সংখ্যা

৫। প্রকাশকের নাম—ডাক্তার সোমনাথ মুখোপাধ্যায়
—(ভারতীয়)
১৭৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৬

৬। প্রকাশকের স্থান—১৩২/১এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৪

৭। মুদ্রকের নাম—ডাক্তার জ্যোতির্ময় শর্মা
—ভারতীয়
—২১/১ দূর্গাচরণ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৩

৮। প্রেসের নাম ও ঠিকানা—অভ্যুদয় কলার & জেনারেল প্রিণ্টার্স,
—৩০, সূর্য্যসেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

৯। সম্পাদকের নাম—ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
—ভারতীয়
—১৩২/১এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৪

১০। স্বত্বাধিকারীর নাম—পাভলভ ইনষ্টিটিউট্—১৩২/১এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৪

আমরা এতদ্বারা বিবৃত করিতেছি যে, ১৩২/১এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত ও অভ্যুদয় কলার & জেনারেল প্রিণ্টার্স হইতে মুদ্রিত "মানব-মন" পত্রিকার আমরা যথাক্রমে প্রকাশক ও মুদ্রক এবং উপরোক্ত ঘোষণা আমাদের বিশ্বাস ও জ্ঞানতঃ সত্য।

স্বাঃ

১। ডাক্তার সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

২। ডাঃ জ্যোতির্ময় শর্মা

সম্পাদক—ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক—অরুণ চক্রবর্তী

ডাঃ জ্যোতির্ময় শর্মা কর্তৃক অভ্যুদয়; ৩০, সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত ও ডাঃ সোমনাথ মুখার্জি কর্তৃক ১৩২/১এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।

অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী

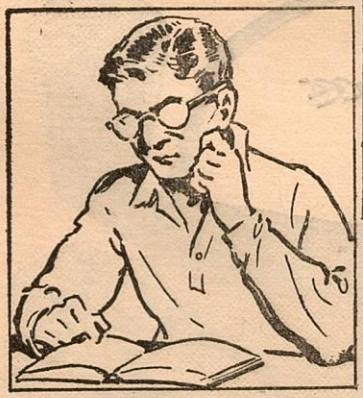

মহাভৃঙ্গরাজ তৈলের বহুবিধ গুণাবলী
সত্যই আশ্চর্য্যজনক।

ইহা যে শুধু কেশের পক্ষেই উপকারী
তাহা নহে, মস্তিস্কের পক্ষেও পরম হিতকর।

সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ
তৈল

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা- ৪৮

কলিকাতাকেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস, (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লণ্ডন) এম, সি, এস,(আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

SA 5/60

অল্প পরিশ্রমেই
আপনি যদি
অবসন্ন হয়ে পড়েন
তখন নিয়মিত ব্যবহারে
ভাইনো-মল্ট
প্রাণোচ্ছল টনিক

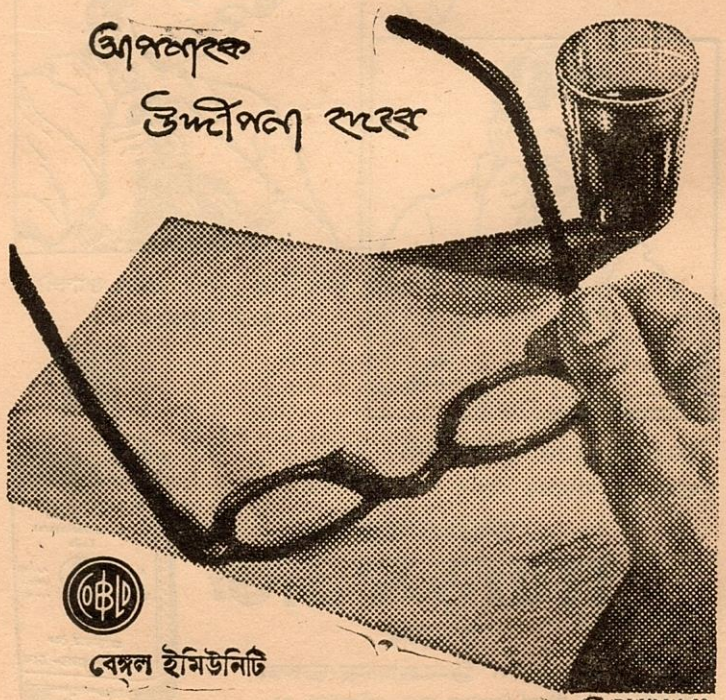

বেঙ্গল ইমিউনিটি
/BI/VM/1-59

ভাল আলোয়

ছোটদের পড়ার জায়গাটি পরিষ্কার আলোয় ঝলমল করা উচিত—তাতে তাদের চোখের ক্ষতি হয় না আর বেশীক্ষণ বই নিয়ে বসতে উৎসাহ পায়। ফিলিপ্‌স-এর বাল্‌বে বরাবরই প্রচুর আলো পাবেন, কারণ বাল্‌ব তৈরীর ক্ষেত্রে ফিলিপ্‌স-এর আছে অতুলনীয় অভিজ্ঞতা আর উৎকর্ষের নিখুঁত মান। বিভিন্ন ওয়াটে পাওয়া যায়। আপনার যে-ঘরে যেমন প্রয়োজন তাই পাবেন।

ভাল পড়াশুনো

PHILIPS

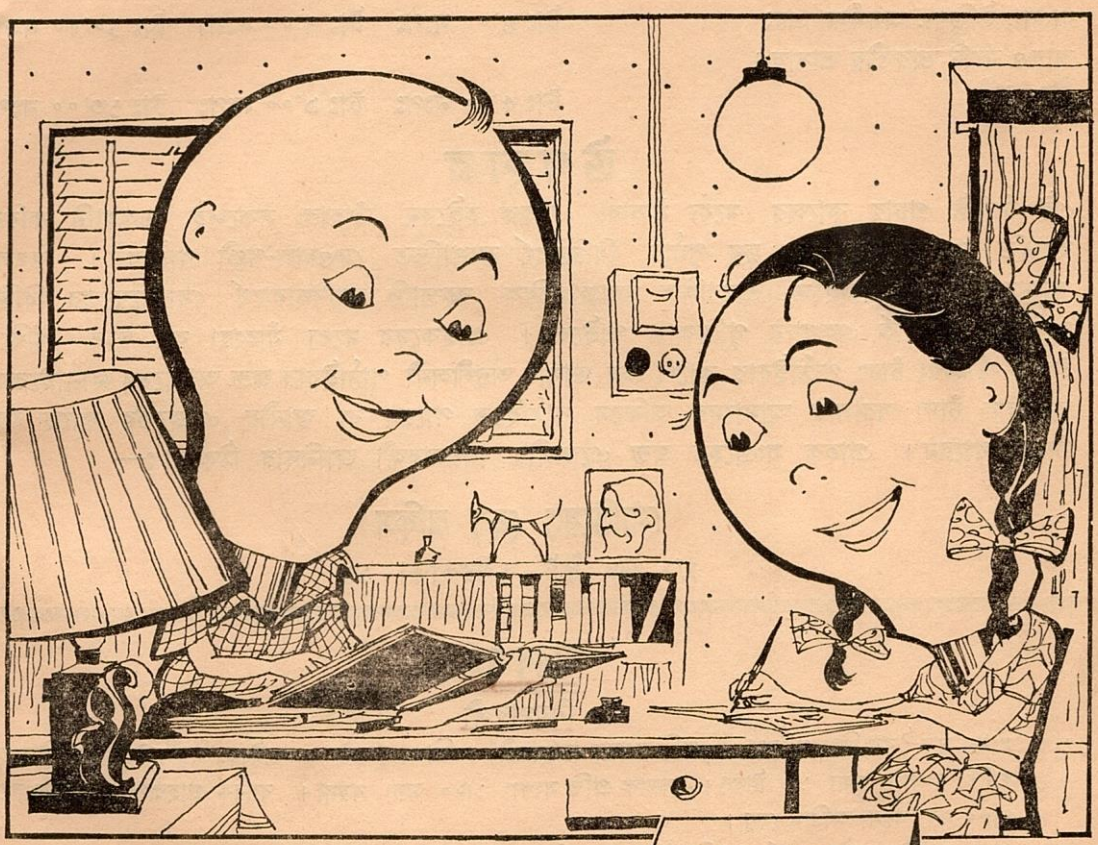

হ্যাঁ, **ফিলিপ্‌স**-এর বাল্‌ব—

এর চেয়ে ভাল বাল্‌ব আর হয় না!

আর মনে রাখবেন—

ফিলিপ্‌স আর্কেল্টা

উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ আলো দেয়

ফিলিপ্‌স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

WTP 5049

পড়ুন ও গ্রাহক হউন—

সোভিয়েত দেশ

(বাংলা, উড়িয়া, অসমীয়া, ইংরাজী, হিন্দী এবং আরও নয়টি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা।)

নতুন বৎসরে গ্রাহকদিগের জন্য বিশেষ সুবিধাবলী ও উপহার

(১৯৬১ সালের ১লা নভেম্বর হইতে ১৯৬২ সালের ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে পাওয়া যাইবে।)

	এক বৎসর	দুই বৎসর	তিন বৎসর
বাংলা, উড়িয়া, অসমীয়া এবং আরও নয়টি ভারতীয় ভাষায়।	টাঃ ৪'০০ নঃপঃ	টাঃ ৭'০০ নঃপঃ	টাঃ ১০'০০ নঃপঃ
ইংরাজী	টাঃ ৫'০০ নঃপঃ	টাঃ ৯'০০ নঃপঃ	টাঃ ১৩'০০ নঃপঃ

উপহার

এই নির্দিষ্ট প্রচার কালের মধ্যে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন তাঁহারা সকলেই একখানি করিয়া বাড়তি কভার পৃষ্ঠা যুক্ত ছয় পৃষ্ঠার বিচিত্রবর্ণ সুশোভিত দেওয়াল-পঞ্জী পাইবেন। তৎসহ আমাদের অফিস হইতে প্রকাশিত মহাজাগতিক রহস্যাদি আবিষ্কারার্থে সোভিয়েতের বিভিন্ন অভিযান সম্পর্কে একখানি পুস্তিকাও পাইবেন। গ্রাহকদের মধ্যে যাঁহারা রুষ ভাষা শিখিতে ইচ্ছুক তাঁহারা চাঁদা পাঠাইবার কালে রুষ ভাষার অনুশীলনী পাঠাইবার জন্য আমাদের জানাইবেন। আপনার চাঁদা সরাসরি আমাদের অফিসে পাঠাইতে পারেন বা স্থানীয় এজেন্টের কাছে জমা দিতে পারেন। গ্রাহক সংগ্রহের জন্য এজেন্সীর নিয়মাবলী জানিবার ঠিকানা :—

সোভিয়েত দেশ অফিস

১/১ উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৬

মানব মন

নিয়মাবলী

১। মানব-মন ত্রৈমাসিক পত্রিকা। প্রতি বৎসর জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে ইহা প্রকাশিত হয়।

২। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ টাকা। সডাক প্রতি সংখ্যা ১।২০ নয়া পয়সা। বার্ষিক গ্রাহকগণের ক্ষেত্রে সডাক ৪।৮০ নয়া পয়সা অগ্রিম দেয়।

৩। চেক্, ড্রাফট, পোষ্টাল অর্ডার, মণিঅর্ডার ইত্যাদি PAVLOV INSTIUTE & HOSPITALS এই নামে প্রদেয়।

৪। এজেন্সি বা ব্যবসায় সংক্রান্ত শর্তাদির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :—

সুভাষ রায় কর্মসচিব
মানব মন
১৩২/১এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪

পাভলভ-গবেষণাগারে দুইদিন

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

আমরা তিনজন মাত্র, অর্থৎ কুমারী সুং (চৈনিক ডেলিগেট), ডাক্তার সিবাবেশী (ইন্দোনেশিয়ান) ও ও আমি গেলাম সুপ্রসিদ্ধ প্যাভলভ্ গবেষণাগারে। শারীরবিদ্যায় প্যাভ্লভের দান অসামান্য। পাকস্থলীতে পাচকাম্লরসের ক্ষরণ থেকে আরম্ভ করে মস্তিষ্কের আবস্থিক প্রতিবর্তন ক্রিয়া (conditioned reflex) পর্যন্ত বহু অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান দিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর তিরোধানের পর চিকিৎসার বিরাট ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে আবস্থিক প্রতিবর্তন ক্রিয়ার সাহায্যে নানা জটিল রোগের চিকিৎসায় আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছে। এই মনীষীর সাধনপীঠ প্রত্যেক শারীরবিজ্ঞানীর কাছে পুণ্য তীর্থক্ষেত্রের মত ; তাই সেখানে উপস্থিত হওয়ামাত্র নিজেকে কৃতার্থ মনে করলাম।

প্যাভ্লভ গবেষণাগারের একাংশ লেনিনগ্র্যাড থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে। আমাদের পৌঁছানর সংবাদ পাওয়ামাত্র প্যাভ্লভের ছাত্র ও উত্তরাধিকারী, সেখানকার ডিরেক্টর অ্যাকাডেমিসিয়ান বারানোভ এসে হাসিমুখে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তারপর আমাদের সঙ্গে করে লেবরেটরির সর্বত্র নিয়ে গিয়ে সেখানে যে সব বিশেষ বিশেষ কাজ হচ্ছে তা দেখালেন ও গবেষকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মাদাম বালাশেনা কুকুরের দেহে বৃক্কের মধ্যে পাথুরী রোগ সৃষ্টির ফলে শুধু বৃক্কেই নয়, পাকস্থলী, লাল-নিঃস্রাবী গ্রন্থি প্রভৃতির ক্ষরণেও মস্তিষ্কের আবস্থিক প্রতিবর্তন ক্রিয়া হেতু কি কি পরিবর্তন লক্ষিত হয়, সে সম্বন্ধে গবেষণা কর্চ্ছেন। আর একজন, মাদাম ননোভা মৃগীরোগের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তার সঙ্গে রক্তের চাপ বৃদ্ধির কার্য-করণ সম্বন্ধ প্রমাণ করেছেন। শুধু তাই নয়, মৃগীরোগীর দৈহিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্যে সাধারণতঃ লুমিন্যাল, প্রভৃতি যে সব স্নায়ু-অবসাদাক ও সুপ্তিকর ওষুধ দেওয়া হয়, তারা রোগ-উপশমের সাহায্য না করে বরং তা বাড়িয়ে তোলে—এ সিদ্ধান্তের কথাও জানালেন। অন্য ভাবে রক্তের চাপ হ্রাস করে কি ভাবে সুফল পাওয়া গেছে তা অনেকগুলি লেখ-চিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে দিলেন। সেখানে গবেষণারত চীনদেশীয় একজন পোষ্টগ্র্যাজুয়েট ছাত্রের সঙ্গে দেখা হলো। নিজের দেশের লোককে সুদূর বিদেশে পেয়ে কুমারী সুং তো মহা খুসী! বিভিন্ন আবস্থিক প্রতিবর্তন ক্রিয়ার অভ্যস্ত অনেকগুলি কুকুরের আন্তর যন্ত্রগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়ার কি ভাবে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, অধ্যাপক বারানোভের নির্দেশে গবেষণারত ছাত্রগণ আমাদের খুব যত্নসহকারে দেখিয়ে দিলেন। আগেই বলেছি, এটি সুপ্রসিদ্ধ প্যাভ্লভ ইন্‌ষ্টিটিউটের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আসল এবং বড় অংশটি প্রায় কুড়ি মাইল দূরে কোল্‌টুশি নামক একটি গাঁয়ে অবস্থিত। অধ্যাপক বারানোভ সেখানে নিয়ে গিয়ে আমাদের সব কিছু দেখাবার ভার দিলেন প্যাভ্লভের আর একজন ছাত্র অধ্যাপক বীকোফের উপর। তাঁর গাড়ীতেই আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম বেলা প্রায় বারোটার সময়। আমাদের গাড়ীখানা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই খালি অবস্থায় গেল সেখানে।

সহরের ডামাডোল থেকে অনেক দূরে কোলটুসি নামে গণ্ডগ্রামখানি, যাকে বলা যায় একেবারে অজ পাড়াগাঁ। অনেকটা পাথর আর বালিতে তৈরী মেটে রাস্তাঘাট, আর তারই মাঝে প্রকাণ্ড একটা দীঘি পার হয়ে তরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন

প্যাভ্‌লভের নিজস্ব ছোট দোতলা বাসভবনটি। আর তারই চারদিকে একে একে গড়ে উঠেছে গবেষণাগারের বিভিন্ন বাড়ীগুলি। প্যাভ্‌লভ দীর্ঘায়ু ছিলেন এবং প্রায় ছিয়াশি বছর বয়স পর্যন্ত অক্লান্তভাবে একান্ত নিরালায় এই শান্তসমাহিত স্থানে বিজ্ঞানের সাধনা করে গেছেন। উৎপীড়ক জারের শাসনকালের নিষ্ঠুর বাধা-নিষেধ, সে দুর্ধর্ষ জার-সাম্রাজ্যের পতন কিংবা পরবর্তী রক্তাক্ত বিপ্লব—কিছুই তাঁর গবেষণা ও সাধনার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে নি—তিনি ছিলেন এমনি বিজ্ঞান ও সত্যানুসন্ধানের একনিষ্ঠ সাধক! তার বাসভবনের সম্মুখেই তার বিশাল প্রস্তর মূর্তিটি অবস্থিত। তাঁর গবেষণার অত্যাবশ্যক অঙ্গ কুকুরটিও আছে তাঁর সঙ্গে। আমাদের গাড়ী সেখানে দাঁড়াতেই আমি যুক্তকরে তাকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করলাম।

অধ্যাপক বীকোফের সঙ্গে প্যাভ্‌লভের আবাসগৃহে ঢুকে আমরা অতি যত্নে রক্ষিত তাঁর ব্যবহৃত শয্যা, টেবিল, চেয়ার, দোয়াত, কলম; পোষাক পরিচ্ছদ, জুতা, মায় সাইকেলটি পর্যন্ত দেখতে পেলাম। বীকোফ বললেন যে, তিনি সর্বদা এই সাইকেলে চড়েই মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সর্বত্র যাতায়ত করতেন। সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী ও সরকার বহু সাধ্যসাধনা করেও তাঁকে ঘোড়ার গাড়ী কিংবা মোটর গাড়ী ব্যবহারের জন্যে নিতে সম্মত করাতে পারেন নি। কি অদ্ভুত অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে গেছেন তিনি, যার একমাত্র পরিচিতি 'plain living and high thinking' এই ইংরেজী কথাটিতেই বুঝায়। তাঁর জীবনের প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তটিও যেন ছিল ঘড়ির-কাঁটার সঙ্গে বাঁধা।

আবস্থিক প্রতিবর্তন ক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে বহিরাগত সকল অবাঞ্ছনীয় উত্তেজনার আড়ালে কুকুরকে গবেষণাকালে বেঁধে রাখবার জন্যে তিনি যে বিশেষ প্রকোষ্ঠটি ব্যবহার করতেন, আজও তা তেমনি আছে। তার ভারপ্রাপ্ত গবেষকটি আমাদের বিশেষ কোন রঙের আলো দেখিয়ে কিংবা নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘণ্টার শব্দ করে কিভাবে কুকুরের লালারসের আবস্থিক প্রতিবর্তন ক্রিয়াজনিত ক্ষরণ ঘটানো হয় এবং কিভাবে বিভিন্ন অভ্যস্ত উত্তেজনার সমন্বয়ে অধিকতর ক্ষরণ ঘটে কিংবা একই সময়ে অনভ্যস্ত উত্তেজনার প্রয়োগে ক্ষরণ ব্যাহত হয়—এসবই দেখালেন প্রকোষ্ঠের অতি পুরু শব্দাভেদ্য দেয়ালের এককোণে ছোট্ট একটি কাঁচের জানালার মধ্য দিয়ে। এতদিন যা শুধু বইতেই পড়েছি এবং না দেখেও যার বর্ণনা তোতাপাখীর মত আউড়ে গেছি বছরের পর বছর ছাত্রদের কাছে, আজ তা স্বচক্ষে দেখে মনে হলো যে প্যাভ্‌লভ নিজেই যেন পাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখাচ্ছেন আমাদের! এ ভাবে কিরূপে অতি হিংস্র কুকুরকেও প্যাভ্‌লভ শান্ত-শিষ্ট করে তুলতেন, সে গল্পও শুনলাম। সেখান থেকে অনতিদূরে আর একটি অনুরূপ ছোট প্রকোষ্ঠের কাছে গেলাম। সেখানে মোরগ নিয়ে আবস্থিক প্রতিবর্তন ক্রিয়ার গবেষণা করা হয়। সেখানে দেখলাম, কোন বিশেষ শব্দ-উত্তেজনায় নিদ্রাভ্যস্ত মোরগের সম্মুখে খাবার দেওয়া সত্ত্বেও ঐ শব্দের পুনঃপ্রয়োগ মাত্র খাবারের প্রতি দৃক্‌পাত পর্যন্ত না করে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু ঐ শব্দে অনভ্যস্ত অপর মোরগটি একই অবস্থায় দিব্যি ঘুরে ঘুরে খাবার খুঁটে খেতে লাগলো. আর মাঝে মাঝে মাথা তুলে, ঘাড় বাঁকিয়ে, ঝুঁটি উঁচু করে এমনভাবে দাঁড়াতে লাগলো যাতে মনে হয় ঐ অনভ্যস্ত শব্দ কোথা থেকে আসছে, তার কোন হদিস্ না পেয়ে অপ্রসন্ন চিত্তে বিরক্তি প্রকাশ কর্চ্ছে।

তারপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো ইঁদুরের প্রকোষ্ঠে। এগুলি এমনিভাবে তৈরী যাতে ইঁদুরগুলি আমাদের উপস্থিতি টের না পায়, অথচ প্রকোষ্ঠের অন্যদিকে যে আয়নাখানিকে বাঁকানো অবস্থায় রাখা হয়েছে তার মধ্যে গবেষণাকালে ইঁদুরের হাবভাব সব কিছু দেখা যায়। প্রকোষ্ঠের মধ্যে অনভ্যস্ত শব্দ প্রয়োগের পর দেখা গেল যে, কতকগুলি ইঁদুর ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা কচ্ছে, আর কয়েকটি ভয়ে জড়সড় হয়ে এক কোণে লুকিয়ে থাকবার প্রয়াস পাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট গবেষকটি বললেন যে, এই ইঁদুরগুলি সম্বন্ধে একটি বিস্ময়কর ব্যাপারে লক্ষ্য

করা হয়েছে যে, ঐ নিরীহ গোবেচারা, ভীতু ইঁদুরগুলির দেহেই অতি সহজে আল্‌কাতরা প্রভৃতি প্রয়োগে ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করা চলে। কিন্তু স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থিরভাবে ছুটে বেড়ায় যেগুলি তারা এভাবে ঐ রোগের দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয় না।

গবেষণাগুলি এতই চিত্তাকর্ষক যে, কি ভাবে সময় চলে গেল, জানতেই পারি নি। ঘড়িতে প্রায় তিনটা বাজে, সুতরাং ক্ষিদেও পেয়েছিল। তাই পরদিন আবার যাব বলে সেদিনের মত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। অধ্যাপক বীকোফ ফেরবার পথে আমাদের গবেষণার জন্যে ব্যবহৃত শিম্পাঞ্জিগুলিকেও দেখিয়ে দিলেন, জালে-ঘেরা গাছপালা সমন্বিত একটি স্থানে।

পরদিন লেনিগ্রাড ক্যান্সার হাসপাতাল থেকে বিদায় নিয়ে আমরা লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছলাম আবার আমার সেই পুণ্য তীর্থক্ষেত্র কোলটুশিতে। অধ্যাপক বীকোফ আগেই সেখানে পৌঁছে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আজ প্রথমেই আমাদের দেখানো হলো—অতি নিম্নস্তরের প্রাণীরাও কিভাবে আবস্থিক প্রতিবর্তন ক্রিয়ার প্রভাবাধীন হয়। একটি কামরায় বড় বড় কাচের ট্যাঙ্কে নানা রঙবেরঙের ছোট ছোট মাছ, বুদ্‌বুদায়িত অক্সিজেন সমন্বিত জলের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। খাবার দেওয়ার সময়ে লাল আলোতে অভ্যস্ত মাছগুলির উপর লাল আলো ফেলা মাত্র তারা যে যেখানে ছিল এসে জড় হলো সে ফুটোর কাছে, যা দিয়ে তাদের খাবার দেওয়া হয়; কিন্তু তার পরিবর্তে হল্‌দে আলো যখন ফেলা হলো তখন আর ঐ রকম কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। তারপর আমরা গেলাম আর একটি ঘরে, যেখানে কাচের কয়েকটি বাক্সের মধ্যে মৌমাছির চাকে অনেকগুলি মৌমাছি সযত্নে রাখা আছে। আরো শুনতে পেলাম যে, প্যাভ্‌লভ নাকি মৌমাছির চাষ ও তাদের হাবভাব জানতে বহু সময় তাদের নিয়ে এ ঘরেই বসে থাকতেন। দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে, মৌমাছির মত ক্ষুদ্র প্রাণী—কতটুকুই বা তার মস্তিষ্ক। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিচিত কোন বিশেষ আলো বা অপর উত্তেজকের প্রভাবে অভ্যস্ত মৌমাছিগুলি যখন চাকের একটি খুপ্‌রি থেকে অপর খুপ্‌রিতে ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে, সেদিকে ঘুরতে থাকে তখন অপরিচিত উত্তেজনার প্রভাবে, অর্থাৎ অনভ্যস্ত মৌমাছিরা ঠিক ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকে।

সাধারণত ডিম প্রসবের ঋতুতে মুরগী দিনে একবার মাত্র ডিম পাড়ে। ভোরবেলা অর্থাৎ অন্ধকার ও আলোর সন্ধিক্ষণই ডিম প্রসবের স্বাভাবিক সময়। ২৪ ঘন্টার মধ্যে কৃত্রিমভাবে আর একবার অন্ধকার ও আলোর সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি করে সেই অবস্থায় আভ্যাসিক প্রতিবর্তন ক্রিয়ার প্রভাবে যে সব মুরগীর দিনে দুবার করে ডিম প্রসব করানো সম্ভব হয়েছে, সেগুলিকে আমাদের দেখালেন একজন গবেষক। আবার দুগ্ধ দোহনকালে দুগ্ধবতী গরুকে গরম জলে স্নান কিংবা কিছুক্ষণ গরম হাওয়াজনিত উত্তেজনায় অভ্যস্ত করবার ফলে কি ভাবে দুধের দৈনিক পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে, তাও বললেন আমাদের কাছে। মানুষের সর্বাপেক্ষা পুষ্টিকর খাদ্য দুধ আর ডিমের পরিমাণ ও সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে প্যাভ্‌লভের পদ্ধতি প্রয়োগ একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়।

আর একজন গবেষক কালো মাদী খরগোস কিংবা মুরগীর ডিম্বকোষ (ovary) কেটে ফেলে সেস্থানে অপর সাদা খরগোস কিংবা মুরগীর ডিম্বকোষ কলম করে তাদের সাদা খরগোসে পরিবর্তন এবং মোরগের সঙ্গে যৌনমিলন ঘটিয়ে বংশগতির উপর কি প্রভাব হয়, তাই লক্ষ্য করছেন। তাতে একটি খুব মজার ব্যাপার দেখা গেছে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় গর্ভাধানের ফলে প্রসূত বাচ্চাদের অর্ধেক সংখ্যক হয় কালো এবং বাকী অর্ধেক হয় সাদা; কিন্তু তৃতীয় ও পরবর্তী গর্ভাধান-প্রসূত সব বাচ্চাগুলিই হয় কালো।

প্যাভ্‌লভের আর একজন কৃতী ছাত্র মাতৃদেহ থেকে সন্তানের দেহে কি ভাবে বিভিন্ন সংবেদীয় জ্ঞান সঞ্চারিত

হয়, সে সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। গর্ভাবস্থায় কুক্কুরীর গায়ে প্রতিদিন কোন উগ্রগন্ধী তৈল মাখিয়ে দেওয়া হয়। এ অবস্থায় সদ্যোজাত বাচ্চাগুলি জন্মের পর কয়েকদিন মাতৃদেহের উগ্রগন্ধের প্রভাবে কিছুতেই দুধ পান করতে মায়ের কাছে ঘেস্‌তে চায় না। তারপর যখন ধীরে ধীরে ঐ গন্ধ তাদের নাকে সয়ে আসে তখন ক্ষিদে পেলেই স্বাভাবিকভাবে প্রসূতির কাছে ছুটে যায়। কুকুরের পক্ষে আত্মরক্ষার প্রথম ইন্দ্রিয় নাসিকা, তারপর স্পর্শেন্দ্রিয় বা ত্বক, তারপর দর্শনেন্দ্রিয় বা চোখ এবং সকলের শেষে শ্রবণেন্দ্রিয় বা কান। ঠিক এ পর্যায়ক্রমেই কুকুরের বিভিন্ন সংবেদনের অভ্যস্ততা লাভ হয়।

ঘড়িতে যখন প্রায় তিনটা বাজে তখন আমরা সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলাম। আমাদের গাড়ীতে তুলে দিতে গিয়ে অধ্যাপক বীকোফ বললেন যে, প্যাভ্‌লভ ইনষ্টিটিউট দেখতে অনেকেই আসেন দু-এক ঘণ্টার জন্যে মাত্র, কিন্তু পরপর দুটি দিন এ রকম নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে সব কিছু দেখবার আগ্রহ খুবই কম থাকে। আমি তার উত্তরে হাসতে হাসতে বললাম যে, আপনাদের মতই আমিও যে সে মহাপুরুষের একজন ছাত্র। সময় ছিল না, থাকলে মহাভারতের একলব্যের গল্পটি তাঁকে শুনিয়ে দিতাম সেদিন।

['জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার অষ্টম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত]

পাভলভ পরিচিতি

রিফ্লেক্স বা পরাবর্ত (৩)

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রিফ্লেক্স কি এবং প্রাণীর পক্ষে রিফ্লেক্সের গুরুত্ব কতখানি? এই প্রশ্নের আলোচনা সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

পাভলভের মতে, রিফ্লেক্স হচ্ছে—"The mechanism of a *definite* connection by means of the nervous system between certain phenomana of the external world and the corresponding *definite* reactions of the organism". বহির্বাস্তবের ঘটনা-বিশেষের সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্র মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংযোজন ব্যবস্থার ফলে জীবদেহের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াকে রিফ্লেক্স বলা হয়। 'নির্দিষ্ট' কথাটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বহির্বাস্তবের কোনো বিশেষ উদ্দীপক যতবারই প্রয়োগ করা হোক না কেন, একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এই প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি স্নায়ুতন্ত্রের এক নির্দিষ্ট সংযোজন ব্যবস্থার ফলে। অর্থাৎ কার্য-কারণ সম্পর্ক সবসময়েই নির্দিষ্ট।

রিফ্লেক্স দু'ধরণের—বললেন পাভলভ। শারীরক্রিয়া ও মননক্রিয়া—প্রাণীর সমস্ত ক্রিয়া-কলাপই রিফ্লেক্সক্রিয়া। শারীরক্রিয়া ও মননক্রিয়ার আসল পার্থক্য কোথায়? এ-যাবত মনন-ক্রিয়ার বিশেষতঃ মানবমনের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার জটিলতা শেরিংটন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মতে ছিল রহস্যাবৃত—অননুমেয়, অপ্রমেয় ও অনির্দিষ্ট। শারীরক্রিয়া ও মননক্রিয়া যেন দুটি সমান্তরাল রেখা। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক সূত্র অনাবিষ্কৃত। শুধু তাই নয়, কোনোদিনই আবিষ্কৃত হবার নয়। এই ছিল এঁদের অভিমত। পাভলভ মননক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিলেন ও শারীরক্রিয়ার সঙ্গে তার পার্থক্য ও সম্পর্ক নির্ণয় করলেন। মনোবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করলেন।

শারীরক্রিয়া সংগঠিত হয় কিভাবে? বাইরের উদ্দীপক প্রথমে স্নায়ু বিশেষকে উত্তেজিত করে স্নায়ুপ্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। তারপর এই উত্তেজনা কেন্দ্রাভিগামী (centripetal) নার্ভমাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে গিয়ে পৌঁছয়। সেখান থেকে কেন্দ্রাভিগ (centrifugal) নার্ভ বেয়ে উত্তেজনা কোন একটি পেশী, গণ্ড বা দেহযন্ত্রে গিয়ে সাড়া জাগায়। এই প্রতিক্রিয়া স্থায়ী ও সুনির্দিষ্ট। একই জাতীয় প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই একটি বিশেষ উদ্দীপক প্রতিবারই একই ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটায়।

মননক্রিয়া কিন্তু অস্থায়ী এবং বহু শর্তের উপর নির্ভরশীল। কোনো মননক্রিয়াই জাতির সকল প্রাণীর পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ধরনের মননক্রিয়া ঘটে বলেই পাভলভ এর নাম দিলেন কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স বা শর্তাধীন পরাবর্ত। আর জাতিবৈশিষ্ট্যসূচক স্থায়ী শারীরবৃত্তমূলক প্রতিক্রিয়াগুলোর নাম দিলেন শর্তহীন পরাবর্ত বা আনকন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স। কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স প্রাণীবিশেষের জীবদ্দশায় আয়ত্ত প্রতিক্রিয়া—ভঙ্গুর ও স্বল্পক্ষণস্থায়ী আর আনকন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স জাতির জন্মগত স্থায়ী শারীরবৃত্তমূলক প্রতিক্রিয়া।

দুই ধরনের রিফ্লেক্সের মধ্যে আর একটি পার্থক্য আছে। আনকণ্ডিশনড রিফ্লেক্স উদ্দীপক-পদার্থের মৌলিক বা মুখ্য গুণাবলীর উপর নির্ভরশীল, আর কন্‌ডিশনড রিফ্লেক্স পদার্থের গৌণগুণাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত। শুকনো খাদ্যকে সিক্ত করা অথবা কঠিন ভোজ্য-দ্রব্যকে নরম করার জন্য যে লালা নিঃসরণ সেটা জীবের শারীরবৃত্তমূলক ধর্ম বা আনকণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স। খাদ্যদ্রব্য মুখগহ্বরের সংস্পর্শে এলে এই লালা নিঃসরণ ঘটবে। আর খাদ্যের চেহারা বা রঙ দেখার বা তার গন্ধ নাকে যাবার দরুন যে লালা নিঃসরণ, তাকে বলা হয় মননধর্মমূলক প্রতিক্রিয়া বা কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স। লালানিঃসরণ যে ধরনের প্রতিক্রিয়া তার সঙ্গে মূলতঃ রঙ, গন্ধ বা শব্দের কোন সম্পর্ক নেই। এই ধর্ম নিয়ে জীব জন্মায় না। এধর্ম সে আয়ত্ত করে জীবদ্দশায়। উদ্দীপক-দ্রব্যের মৌলিক গুণগুলোর শারীরবৃত্তমূলক প্রতিক্রিয়ার সঙ্কেত এই গৌণগুণগুলোতে বর্তায়। প্রাণী বহির্বাস্তবের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার প্রচেষ্টায় নিয়ত নতুন ধর্মের বা কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্সের অধিকারী হতে থাকে। পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স ভেঙ্গে পড়ে, নতুন রিফ্লেক্স গড়ে ওঠে। এই ভাঙ্গা-গড়ার খেলার মধ্য দিয়ে প্রাণী এগিয়ে চলে তার পরিণতির দিকে।

কণ্ডিশনড রিফ্লেক্স সম্পর্কিত এই প্রত্যয় [বহির্বাস্তবের সঙ্কেত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে যথাযথ পৌঁছে দেওয়া ও শারীরবৃত্তমূলক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সেই সঙ্কেতকে সম্পর্কিত করা] পাভলভের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অবদানের গুরুত্ব অপরিসীম। কোপরনিকাস্, নিউটন, ডারুইনের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছেন পাভলভ—এই মৌলিক বিশিষ্ট অবদানের জন্য।

ডারুইনের অনুবর্তী পণ্ডিতগণের (জীবের উপর পরিবেশের প্রভাব) ব্যাখ্যায় "পূর্বনির্ধারণ" (Pre-determinism) তত্ত্বের ছোঁয়াচ আছে। সহজাত আদিম প্রবৃত্তি অনুযায়ী এই প্রভাব পূর্বনির্ধারিত, এই রকমের প্রচার বিজ্ঞানী মহলে আজও চালু। অভিযোজক (adaptive) পরিবর্তনের উন্মেষ ব্যাখ্যায় আকস্মিকতা তত্ত্বের আশ্রয় নেওয়া হয়। বলা হয়, যোগাতমের উদ্বর্তন প্রচেষ্টায় বাছাই করা রীতিতে নতুন ধর্মের উন্মেষ ঘটেছে। প্রাণীবিশেষের অভিযোজন ধর্মের কোন হদিশ এঁরা দিতে পারেন না। তাই অনেক পণ্ডিতের কাছে আজও বিবর্তনের ইতিহাস রহস্যাবৃত। পাভলভ এই রহস্যের সমাধান-সূত্রের সন্ধান দিলেন। শুধু সন্ধান দিলেন বললে ভুল হবে, তিনি প্রয়োগশালায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁর যুক্তি প্রমাণিত

করলেন। তাঁর যুক্তি 'পূর্বনির্ধারণতত্ত্বকে' খণ্ডন করল। তা বলে, কার্যকারণ সম্পর্কের অবশ্যম্ভাবিতাকে অস্বীকার করল না।

পরিবেশকে পাভলভ দুই দিক থেকে বিচার করলেন। একটা মোটামুটি স্থায়ু এবং আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী দিক, আর একটা পরিবর্তনশীল দিক। পরিবেশের এই দুই দিকের সঙ্গে অভিযোজন দুই ধরনের রিফ্লেক্স বা স্নায়ু-প্রক্রিয়ার কাজ। এরা কিন্তু পরস্পর সম্পর্কিত, মোটেই নিরপেক্ষ নয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ কম-বেশী একই রকম থাকতে পারে হাজার হাজার বছর ধরে। কোনো প্রাণী জাতির পক্ষে—অনেকদিন ধরে এই ধরনের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে টিঁকে থাকা অপেক্ষাকৃত সহজ। পাভলভের মতে এই অভিযোজন সম্পাদিত হয়—আন্‌কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স দ্বারা। আন্‌কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স বংশগত ও অপরিবর্তনীয়। এদের মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। বংশধারা রক্ষক বা যৌন রিফ্লেক্স আর ব্যক্তি সংরক্ষক রিফ্লেক্স, যেমন খাদ্য রিফ্লেক্স ও আত্মরক্ষামূলক রিফ্লেক্স। উদাহরণ অনেক দেওয়া যেতে পারে। গলায় কোনকিছু বাইরের জিনিষ ঢুকলে কাশি হয়, ঐ জিনিষটাকে বের করে দেওয়া এই কাশির উদ্দেশ্য। তেমনি হাঁচি হয় নাকের ভেতর কোনকিছু যদি ঢোকে। মুখে খাবার ঢুকলে লালা নিঃসরণ হবেই, ও খাবারটা গলাধঃকরণ করবার চেষ্টা আপনা থেকেই হবে। এগুলো সরল আন্‌কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স। আবার প্রাণীজগতে অনেক জটিল আন্‌কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স আছে। অনেকগুলো সরল রিফ্লেক্স একটার পর একটা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ঘটতে থাকে—ফলে দেখতে পাই মৌমাছি ও পিঁপড়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন, কয়েক জাতীয় পাখীর আকাশ পথে হাজার মাইল অতিক্রমণ।

মাকড়সার জাল বোনা, বাবুই পাখীর বাসা তৈরী,—এগুলোও আন্‌কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্সের জটিল বিন্যাস। সাধারণভাবে একে সহজাত প্রবৃত্তি বলা হয়। পাভলভ রিফ্লেক্স কথাটি ব্যবহার করলেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে। রিফ্লেক্স কথাটির মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কের ইঙ্গিত রয়েছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ অনেকগুলি সরল আনকন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্সের বিন্যাস থেকে এইসব আপাতদৃষ্টিতে কঠিন ও জটিল কাজ কিভাবে সম্পন্ন হতে পরে, পাভলভ এই রিফ্লেক্স কথাটি ব্যবহার করে সে সম্বন্ধে অনেকটা হদিশ দিলেন। তিনি বললেন, "the chain-like character of the process, the compounding of a complex effect from simple components, whereby the end of one action is the stimulus for the beginning of another"—দিয়ে এই ধরনের অঙ্গাঙ্গীসংযুক্ত অতি সূক্ষ্ম ব্যবহারেরও ব্যাখ্যা করা যায়। একটি সরল রিফ্লেক্সের শেষ প্রক্রিয়া অপর একটি রিফ্লেক্সের উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে—পাভলভের এই ধারণা—জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়াকলাপের রহস্য-যবনিকা উন্মোচন করল। এই আন্‌কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স প্রাণীর প্রাথমিক অভিযোজন ব্যবস্থা [adaptive machanism]। একক ও জাতিগতভাবে এই রিফ্লেক্স প্রাণীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। এ ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। নিম্নমস্তিষ্ক [sub cortex] এই রিফ্লেক্সের নিয়ন্ত্রক।

প্রাকৃতিক পরিবেশ যদি পরিবর্তনশীল না হত—এই রিফ্লেক্সের সাহায্যেই প্রাণী টিঁকে থাকতে পারত। অবশ্য উদ্‌বর্তন বা বিবর্তন সম্ভব হত না। কিন্তু সব প্রাণীর পরিবেশই মাত্র আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী। পরিবেশের বিভিন্নতা তো আছেই—তাছাড়া পরিবেশ নিয়ত বদলায়। খাদ্য মুখের কাছে পাওয়া যায় না, খুঁজে নিতে হয়। আত্মরক্ষা সবসময়ে সম্ভব নয় বলে যতদূর সম্ভব বিপদকে এড়িয়ে চলতে হয়। যৌনসঙ্গীও প্রয়োজনমত জুটিয়ে নিতে হয়। এসবের জন্য—পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্যে—আন্‌কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স বিশেষ কোনো কাজে লাগে না। আন্‌কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্সের স্থায়িত্ব ও অনড়ত্ব পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে অভিযোজন-কার্যের সহায়ক না হয়ে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা জানি অনাদিকাল থেকেই প্রাণীজগতে বিবর্তন ঘটে আসছে। প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে কোনোমতে মানিয়ে নিয়ে শুধু টিঁকে থাকাই প্রাণীজগতের ইতিহাস নয়। পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে একক জীবনে সে বেঁচে থেকেছে—আবার এইভাবে নতুন গুণের অধিকারী হয়ে সেই গুণ সন্তান-সন্ততিতে সংক্রমিত করেছে। এই প্রয়োজনে প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রে এমন এক ব্যবস্থার নিশ্চয়ই উদ্ভব হয়েছে যার ফলে সতত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন সম্ভব সে ব্যবস্থা আন্‌কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্সের বিপরীতধর্মী নিশ্চয়ই। এই ব্যবস্থায় থাকবে দরকারমত নতুন গুণ বা ধর্মের উন্মেষ ও বিলোপ। পরিবেশের প্রয়োজনে প্রাণী নতুন ধর্ম আয়ত্ত করবে, সে ধর্ম হবে অস্থায়ী ও পরিবেশসাপেক্ষ। প্রয়োজন ফুরোলে—এই ধর্মের বিলোপ ঘটবে, এবং নতুন প্রয়োজনে আবার নতুন ধর্ম গড়ে উঠবে। ঠিক এই ধরনেরই ব্যবস্থা রয়েছে পাভলভ আবিষ্কৃত কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্সে। খাদ্য, সঙ্গী বা বিপদের সঙ্কেতে—মস্তিষ্কে নতুন সাময়িক সংযোজন ঘটে নতুন ধর্মের, নতুন প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। আবার সঙ্কেত যখন থাকে না, সাময়িক সংযোজন বিনষ্ট হয়,—হয় নতুন প্রতিক্রিয়ার বিলোপ। কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্সের নিয়ন্ত্রণ-কর্তা গুরুমস্তিষ্কের উপরিভাগ। যাকে বলি cerabral cortex।

দুই পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের এই দুই প্রায় বিপরীত ধর্মী ব্যবস্থার ফলে প্রাণী পরিবেশের প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনের সঙ্গে অতি নিপুণভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। এই দুই রিফ্লেক্স ব্যবস্থা পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

এই দুই ব্যবস্থা নিগূঢ়ভাবে সম্পর্কিত ও এই সম্পর্ক কয়েকটি নির্দিষ্ট সূত্রে আবদ্ধ। প্রয়োগ-শালায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা মারফত পাভলভ সেটা প্রমাণ করলেন।

কোন কুকুরের মুখে যদি খানিকটা তরল এ্যাসিড ঢেলে দেওয়া যায়, কুকুরটি বিশেষ অঙ্গভঙ্গী করে প্রথমে এ্যাসিড্‌টা মুখ থেকে বের করে দেবে। সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখ-গহ্বরে প্রচুর পরিমাণে লালা আসতে থাকবে: উদ্দেশ্য এ্যাসিডকে আরও তরলীকৃত করে মুখ থেকে সম্পূর্ণভাবে ধুয়ে বের করে দেওয়া। এটা একটা আত্মরক্ষামূলক আন্‌কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স। কুকুরের জাতিগত বৈশিষ্ট্য—জন্মলব্ধ স্থায়ী ক্ষমতা। এর জন্য নার্ভতন্ত্রে কোন নতুন পথ তৈরীর প্রয়োজন নেই। মাত্র দুভাবে এ ক্ষমতার বিনাশ ঘটতে পারে। মুখপেশীর চেষ্টাবহা (motor nerve) নার্ভ ও

লালা নিঃসরক গ্রন্থির [salivary glands] বহির্বহা [efferent] নার্ভগুলো কেটে দিলে অথবা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশবিশেষ [যেখানে অন্তর্বহা নার্ভ থেকে এই উত্তেজনাস্রোত বহির্বহা নার্ভে সঞ্চারিত হয়] নষ্ট হলে—এই প্রতিক্রিয়া ঘটবে না।

এখন ধরুন, কয়েকবার এ্যাসিড্ মুখে ঢালবার ঠিক আগে একটা ঘণ্টা বাজানো হল। কিছুক্ষণ পরে শুধু ঘণ্টা বাজালেই পূর্ববর্ণিত প্রতিক্রিয়াগুলো দেখা যাবে। সেই মাথামুখের পেশীর সঙ্কোচন, সেই লালা নিঃসরণ—ঠিক আগেরবারের মত। এবার কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স তৈরী হয়েছে। এই রিফ্লেক্স ও লালাগ্রন্থী ও মুখের পেশীর চেষ্টাবহা নার্ভগুলো কেটে দিলে—দেখা যাবে না। তবে এবারের বিশেষত্ব এই যে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মস্তিষ্ক-সংযোগকারী অন্তর্বাহী [afferent] নার্ভগুলো বিচ্ছিন্ন করে দিলেও এই রিফ্লেক্স আর দেখা যাবে না।

নতুন একটি নার্ভ-পথ তৈরী হয়েছে এক্ষেত্রে। ঘণ্টা না বাজিয়ে যদি আলো দেখান হত তবে এই নার্ভ-পথ তৈরী হত দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে। তেমনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গেও নার্ভ-পথ তৈরী হতে পারত। মোটকথা, দূর থেকে উদ্দীপকগ্রাহী যে কোনো ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই এ সংযোজন সম্ভব।

এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উচ্চতম অংশে—যাকে গুরুমস্তিষ্ক বলা হয়, এক নতুন ধরনের জটিল প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অন্তর্বাহী নার্ভপথের সঙ্গে আনকন্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্সের লালা নিঃসারক ও পেশীসঞ্চালক ক্রিয়াকলাপের সংযোগ ঘটেছে। অ্যাসিডের সঙ্কেতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আনকনডিশন্‌ড রিফ্লেক্স। অনড় নিম্নমস্তিষ্কের ক্ষমতা নেই এই যোগাযোগ- এই নতুন স্নায়ুপ্রক্রিয়া সংঘটিত করবার। গুরুমস্তিষ্কের বিশেষ ধর্মযুক্ত নার্ভকোষের এই ক্ষমতা থাকার দরুন, সম্ভব হয়েছে এই ধরনের যোগাযোগ—কনডিশন্‌ড রিফ্লেক্সের উদ্ভব। গুরুমস্তিষ্ক নষ্ট হলে কনডিশন্‌ড রিফ্লেক্স বিলুপ্ত হয়। এটাই প্রমাণ করে যে গুরুমস্তিষ্ক কনডিশন্‌ড রিফ্লেক্সের নিয়ন্ত্রক।

আনকনডিশন্‌ড উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গে কনডিশন্‌ড উদ্দীপক বা সঙ্কেত কয়েকবার মস্তিষ্কে পৌঁছলে তবেই কনডিশন্‌ড রিফ্লেক্স তৈরী হয়। অবশ্য পুরনো কনডিশন্‌ড রিফ্লেক্সের ভিত্তিতে নতুন কণ্ডিশনড রিফ্লেক্স গড়ে উঠতে পারে। এই তথ্যের বিশেষ তাৎপর্য আছে। কনডিশন্‌ড রিফ্লেক্স ব্যবস্থা যদি আনকনডিশন্‌ড রিফ্লেক্স ব্যবস্থার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত ও নিরপেক্ষ হত—তা হলে প্রাণীর পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হাজার হাজার অর্থহীন উদ্দীপক মস্তিষ্ককে অস্থির করে তুলত। ফলে ঘটত দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অনর্থক শক্তির অপচয়। কনডিশন্‌ড রিফ্লেক্স ব্যবস্থা এমনভাবে আনকনডিশন্‌ড রিফ্লেক্স ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে প্রাণীর প্রতিটি প্রতিক্রিয়াই সাধারণতঃ উদ্দেশ্যমূলক ব্যক্তিস্বার্থ বা জাতি স্বার্থের পরিপোষক হয়ে ওঠে। পরিবেশের সেইসব সঙ্কেতেই মাত্র প্রাণী সাড়া দিয়ে থাকে, যেগুলো তার পক্ষে বিশেষ অর্থপূর্ণ।

কনডিশন্‌ড রিফ্লেক্সের এই বৈশিষ্ট্য প্রাণীর অভিযোজন ক্ষমতার চরম উন্নতির পরিচায়ক। এই সম্পর্কে পাভলভ বলেছেন—"The nervous system is an inexpressibly complex and

delicate instrument for relations and connections between the numerous parts of a living organism and between the organism, as a most complex system, and the infinite number of outward factors which may influence it. If, at present, the switching on and off of an electric current has become a most common technical device in our daily usage, surely there is no reason to argue against the realisation of the same principle in the most wonderful instrument that we are now discussing."

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা ব্যবস্থায় ফ্রয়েডবাদ ও প্রয়োগবাদ

প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত

যে কোনো যুগে, যে কোনো দেশে তার দর্শন, সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং মানব-জীবন ও প্রকৃতি সম্বন্ধীয় ধারণাগুলি কতকগুলি চিন্তাসমষ্টিতে কেন্দ্রীভূত হয়, যা মোটামুটিভাবে তৎকালীন সমাজ মেনে নেয়। এই সাধারণ দর্শনের একটা সম্প্রসারণ স্বরূপ শিক্ষা-দর্শন সমাজের মূল্যবোধকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করে। সেইজন্য একটা বিশিষ্ট সমাজের সাধারণ শিক্ষার যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি (rationale) তার দর্শনে ও সমাজ-বিজ্ঞানেই অন্তর্নিহিত থাকে। বলা বাহুল্য, শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রক্রিয়া, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু, সবই নির্ধারিত হয়, যাঁরা সমাজে কর্তৃত্ব করেন তাঁদেরই দ্বারা।

পক্ষান্তরে, শিক্ষার্থীদের প্রবণতা, ক্ষমতা, হিতাহিত জ্ঞান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রণালীর উৎকর্ষ এবং এইসব সম্পর্কিত আরও নানা বিষয় শিক্ষামনস্তত্ত্বের অন্তর্গত। শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি মানুষের ব্যবহারের (behaviour) বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি করা হয়। শিক্ষা-দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-মনস্তত্ত্ব, বিভিন্ন বিষয়বস্তু হলেও, পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যে কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সেই দেশের দার্শনিক, রাজনীতিক, অর্থনীতিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও নৈতিক দর্পণ বললে কিছুমাত্র ভুল হবে না। এই শিক্ষাব্যবস্থাতে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে সেই দেশের চরম মূল্যবোধের মাপকাঠি। আরও একটি কথা এই যে, সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষানীতির পরিবর্তন ঘটে থাকে।

আমেরিকার সমাজ কিভাবে তার শিক্ষাদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, তার কিছুটা আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থাকে অনেকেই জগতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থা বলে মেনে নিয়েছিলেন। আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা বিচার করে যে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন তা নয়; একটা ভ্রান্ত মনস্তাত্ত্বিক কারণেই তাঁদের এই ধারণা জন্মেছিল। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন যে, যেহেতু আমেরিকা শিল্পে-বাণিজ্যে সব থেকে অগ্রসর জাতি, সেই কারণে তার শিক্ষাব্যবস্থাও সবথেকে উন্নতই হবে, কেননা শিক্ষায় উন্নত না হলে শিল্পে অগ্রগতি হবে কি করে?

যাইহোক, গত শতাব্দীতে আমেরিকার শিক্ষাবিদ্‌রা ইয়োরোপের শিক্ষাবিদদের মত বিশ্বাস করতেন যে মনকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তৈরি করাই শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য; মানুষের বুদ্ধিকে

এইভাবে বর্ধিত ও উৎকর্ষিত করতে পারলেই, সে সকল অবস্থায় জীবনে সার্থকতা অর্জন করতে পারবে। কাজেই ইয়োরোপের ন্যায় আমেরিকাতেও ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র ও লাতিন, গ্রীক শেখানো, অর্থাৎ ক্লাসিকাল শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হত। এই শিক্ষার অপর নাম ছিল লিবেরাল শিক্ষা। এই ব্যবস্থায় মানুষের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা ও বিশেষ করে নৈতিক চরিত্র গঠনের উপর এবং প্রাচীন ভাষা শিক্ষার উপরে খুবই জোর দেওয়া হত।

কিন্তু দ্রুত শিল্প-বিপ্লবের ফলে সামাজিক পরিবর্তনও দেখা দিল, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকায় একদল দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক পুরাতন শিক্ষানীতিকে চ্যালেঞ্জ করলেন। এঁরা নিজেদের নাম দিলেন Pragmatist বা প্রয়োগবাদী। এদের প্রধান পুরোহিত হেন্‌রী জেম্‌স্ বলেন ঃ

"Pragmatism does not stand for any special result. It is a method only. It is an attitude of orientation. The attitude of looking away from first things, principles, 'categories', supposed necessities ; and looking toward last things, fruits, consequences, facts. It has no dogma and no doctrine save its methods." (Pragmatism, 1908)

জেমসের পর আসলেন ডিউয়ী। বহু দার্শনিক গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও প্রচারের মাধ্যমে ডিউয়ী প্রয়োগবাদকে বিংশ শতাব্দীর আমেরিকার একচেটিয়া পুঁজিবাদের শিক্ষা-ধর্মে পরিণত করলেন। ডিউয়ী প্রয়োগবাদকে কোনো কোনো সময় Instrumentalism অথবা experimentalism নাম দিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে (১৯৫২ সালে ডিউয়ীর মৃত্যু হয়) তিনিই ছিলেন আমেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রে মহাগুরু ও আন্‌ক্রাউণ্ড কিং।

যে সময়ে আমেরিকায় প্রয়োগবাদ তার প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে, ঠিক সেই সময় ইয়োরোপে ফ্রয়েডবাদের আবির্ভাব। প্রয়োগবাদ ও ফ্রয়েডবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদ-বৃক্ষের দুটি শাখা। আমেরিকায় এদের মিলন ঘটতে বিলম্ব হল না। প্রয়োগবাদে পুষ্ট একদল মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়েড-অ্যাডলার ইউঙকে লুফে নিলেন ও নিজেদের নূতন নামকরণ করলেন—প্রগতিবাদী (progressive) শিক্ষাবিদ। ফ্রয়েডবাদও আমেরিকায় এইভাবে প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করে ইয়োরোপে প্রত্যাবর্তন করে ধ্বংসোন্মুখ ধনবাদী সভ্যতার ধর্মগুরুর আসনে জাঁকিয়ে বসল এবং সগৌরবে পশ্চিমী সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় সাহিত্য, কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে, শিল্পে, দর্শনে, শিক্ষায় প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার লাভ করতে লাগল।

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষা আমেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে দিল। মানব-মনের চিরাচরিত ধারণাকে হটিয়ে দিয়ে তার স্থান অধিকার করে বসল ফ্রয়েডীয় Psyche—যার মূল শক্তি Libido হল প্রধানত মানুষের ইচ্ছাশক্তি (will) কথাটি লাতিন থেকে নেওয়া হয়েছে—যার অর্থ কাম-প্রবৃত্তি। ফ্রয়েডীয় Libido হল মানুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, বিশেষ করে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ

করার আগ্রহ এবং এইটাই হল ফ্রয়েডের মতে মানুষের সর্বপ্রকার কর্মপ্রচেষ্টার মূল উৎস, সর্বপ্রাথমিক বাস্তব সত্য। বিশ্বজগত, মানবসমাজ, মানুষের চিন্তাজগত, মানুষের আদর্শ ও মূল্যবোধ এই সবকিছুই হয়ে গেল গৌণ।

ফ্রয়েড, তাঁর ইয়োরোপীয় শিষ্যরা ও আমেরিকার 'প্রগতিবাদী' মনস্তাত্ত্বিকরা "বৈজ্ঞানিকভাবে" দেখাবার চেষ্টা করলেন যে, যা নিয়ে মানুষ গর্ব অনুভব করে—বুদ্ধিবৃত্তি, বিচারশক্তি, নীতিশাস্ত্র, মূল্যবোধ—এসব কিছুর অন্তরালে রয়েছে একটা গুপ্ত, অন্ধকারাচ্ছন্ন, দানবীয় শক্তি যাকে বশ করা যায় না, শৃঙ্খলাবদ্ধ করা যায় না, যে শক্তি মানুষকে তার অজ্ঞাতে নিগূঢ়ভাবে ও অপ্রত্যাশিতভাবে চালনা করে, ও তার দ্বারা তার কর্ম, ব্যবহার ও জীবন নির্ধারিত হয়; শিক্ষার দ্বারা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিক চরিত্র ও তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর যতই উৎকর্ষ সাধন করা হোক না কেন, সে এমন একটা স্থানে এসে পৌঁছবে যেখানে একটা অজ্ঞাত ও অযৌক্তিক শক্তি এসে তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলবে।

প্রগতিবাদীরা আরও বললেন, যে যদি জগৎ কোনো শাশ্বত ও যুক্তিযুক্ত নিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীন না হয়, যদি কোনো নৈতিক শক্তির দ্বারা বিশ্ব চালিত না হয়, তাহলে মানুষের আচরণের জন্যও কোনো প্রকারের সঠিক নিয়মকানুন আগে থাকতে বেঁধে দেওয়া যেতে পারে না। প্রত্যেক মানুষকে তার বাস্তব জীবনে ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তার জীবনকে বিকশিত করার জন্য ও সার্থক করার জন্য তার আচরণের ছাঁচ তৈরি করে নিতে হবে। প্রত্যেক মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ, একেবারে একমেব দ্বিতীয়ম্—সে কেবলমাত্র তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও নিয়মের দ্বারা চালিত হবে। তার মূল্যবোধ তাকে নিজেকেই সৃষ্টি করে নিতে হবে। অন্যলোকের সৃষ্ট মূল্যবোধ তার সম্বন্ধে অচল।

এই মতবাদের উপর ভিত্তি করে আমেরিকায় যে শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে উঠল, ডিউয়ী তার দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি বললেন, পরিবর্তনশীল জগতে সব কিছুর মতো মানুষও সব সময় বদলাচ্ছে, ও জীবনে আমরা সর্বদা নতুন নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি, সুতরাং মানুষের জীবনটা হচ্ছে নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সুবিন্যস্ত করে নেওয়ার (adjustment) একটা অবিরাম প্রচেষ্টা। [এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ডিউয়ী ও প্রগতিবাদীরা যে পরিবর্তনের কথা বললেন তা হেগেলীয় বা মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বমূলক পরিবর্তন নয়—যা

(১) এই প্রসঙ্গে Bertrand Russell তাঁর History of Western Philosophyতে বলেছেন (পৃঃ ৭৫৯): "In one form or another, the doctrine that will is paramount has been held by many modern Philosophers, notably Nietsche, Bergson, James, and Diwey. It has, moreover, acquired a vogue outside the circles of professinal philosophers. And in proportion as will has gone up the scale knowledge has gone down. This is, I think, the most notable change that has come over the temper of philosaphy in our age.

সমাজকে একটা নূতন ও উচ্চতর সমন্বয়ের (synthesis) দিকে নিয়ে যায়। প্রয়োগবাদীদের কথা হল বর্তমান ধনবাদী সমাজের মধ্যেই নিজেকে খাপ খাইয়ে—(adjust) নিতে হবে।]

প্রয়োগবাদীরা যে নতুন শিক্ষানীতি দাঁড় করালেন তার মূলকথা হল একচেটিয়া-ধনবাদী সমাজে খাপ খাইয়ে নেবার শিক্ষাব্যবস্থা। পূর্ববর্তী সমাজে ছিল ছোট ছোট স্বাধীন শিল্পপতিদের (entrepreneurs) যুগ ; তারাই সমাজে কর্তৃত্ব করত। তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে স্বাধীন নাগরিক করে গড়ে তোলা ও তাদের শিক্ষানীতি ছিল লিবেরাল শিক্ষা। সেই যুগেও বুর্জোয়া সমাজ ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সে যুগের বুর্জোয়া দর্শন ছিল মিল, স্পেনসার, ডারউইনের জনহিতকর প্রয়োজন বাদ (utilitarianism)—যে দর্শনে ব্যক্তিবাদের সঙ্গে সমাজ কল্যাণের অন্তত একটা যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা ছিল। তখনকার দিনে বুর্জোয়ারা সমাজ কল্যাণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যক্তিস্বার্থকে অন্ততঃ আলোকসম্পন্ন (enlightened self-interest) করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন সে যুগের পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান যুগ হল একচেটিয়া ধনবাদের যুগ ; একচেটিয়া মূলধনের মালিকরাই হলেন বর্তমান আমেরিকার সমাজের হর্তাকর্তা বিধাতা। পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতি বর্তমানে অচল ; আজকার নিছক উলঙ্গ ব্যক্তিবাদের পরিস্থিতির উপযোগী নতুন শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজন।

প্রয়োগবাদীরা তারস্বরে পুরাতন লিবেরাল শিক্ষাকে বরবাদ করে দিলেন। কিন্তু তাঁরা বাথটাবের জলের সঙ্গে শিশুটিকেও নর্দমায় ফেলে দিলেন। তাঁরা অনেক গুরুগম্ভীর দার্শনিক কথা বললেন বটে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষাদর্শন দিতে পারলেন না। তাঁদের সব কিছুই হল নেতিবাচক। পুরাতন মূল্যবোধকে তাঁরা ধ্বংস করলেন, কিন্তু নতুন মূল্যবোধের জন্ম দিতে অক্ষম হলেন। এত বহ্বারম্ভের পর তাঁদের মূল বক্তব্য হল 'খাপ খাইয়ে নাও'।

কিন্তু খাপ খাইয়ে নেওয়ার শিক্ষা-পদ্ধতিটা কি ? স্কুল, কলেজে এই মতবাদ কি ভাবে প্রয়োগ হল ? এইসব প্রয়োগ-বাদীদের মতে সব থেকে ভাল শিক্ষাব্যবস্থা হল সেই শিক্ষা ব্যবস্থা, যাতে সব মানুষের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রম ও বিষয় বস্তু প্রবর্তন করা ; যার দ্বারা প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী নিজের রুচি, প্রবণতা, ইচ্ছা অনুসারে নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ লাভের সুযোগ পেতে পারে। প্রগতিবাদীরা বললেন বিষয়বস্তুগুলিকে ইতিহাস ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি এইরকম নির্দ্দিষ্ট ভাবে ভাগ করে দিলে চলবে না ; বরং এগুলিকে এমন ভাবে নতুন করে সাজাতে হবে, এবং সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আরও এমন প্রচুর বিষয় বস্তু প্রবর্ত্তন করতে হবে, যে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী তার থেকে বেছে নেবার সুযোগ পেতে পারে। এই নতুন শিক্ষা পদ্ধতির তাঁরা নাম দিলেন "শিশুকেন্দ্রিক" (child centred) শিক্ষা। পূর্বে ছিল জ্ঞানার্জন করা শিক্ষার উদ্দেশ্য, এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য হল growth of the whole child। হেনরী জেমসের কথায়, "First things" "Principles," মূল্যবোধের আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই ; "Last things", "Fruits"এর প্রতি জোর দিতে হবে ; প্রত্যেক শিশুর জীবনকে সার্থক করে তুলতে হবে, সফল করতে হবে। আর

আমেরিকায় সফলতার মাপকাঠি হল ডলার অর্জন করা—যে যত বেশী ডলার অর্জন করতে পারবে সে তত বেশী সফল হবে। ডলারই হল জীবনের চরম উদ্দেশ্য, last thing, fruit।

প্রগতিবাদী শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা অনুযায়ী যদি কোনো শিশু মনে করে যে পোকার ও ব্রিজ খেলেই তার জীবন বিকাশ লাভ করবে, সে জীবনে সফলতা অর্জন করবে, তাহলে স্কুলে তাকে পোকার খেলাই শেখাতে হবে। অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান সাহিত্য, এসব তাকে না শিখলেও চলবে। আমেরিকার একজন প্রধান শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক উডরিং এই "প্রগতিবাদী শিক্ষা" সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

> "যে আমেরিকান সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার চাইতে ফলাফল ও অর্থের মূল্যই জনসাধারণকে বেশী করে আকর্ষণ করছে, সেখানে এই শিক্ষা ব্যবস্থা যে প্রথম থেকেই জনপ্রিয় হবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?" (Fourth of a Nation, p57)

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে, আমেরিকার প্রত্যেক স্কুল কলেজের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়ে গেল, কে কতবেশী পাঠক্রমের (course) প্রবর্তন করতে পারে। আমেরিকান সরকারের অফিস অব এডুকেশন হিসাব করে দেখেছেন সে সেখানকার স্কুল কলেজে ২৭৪টি 'কোর্স' প্রবর্তন করা হয়েছে, যাতে পরীক্ষা দেওয়া যায় ও ডিপ্লোমা পাওয়া যায়। তার কয়েকটি নমুনা ঃ Poker Playing, Birdge, Dating (অর্থাৎ ছেলে মেয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত হবার বিদ্যা), Driving, Stage and Costume Design, Principles in Advertising Media, Office Management, Principles of Retailing, Methods in Minor Sports, Football, Indoor Games, Rest, Social Dancing, Marriage এবং এই ধরণের আরও কত কি ? বিষয়বস্তু গুলির মধ্যে আর ভেদা-ভেদ রইল না, সবগুলির মূল্যই সমান হয়ে গেল। ছাত্র ও শিক্ষকের নিকট ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রী, অঙ্কশাস্ত্র, সাহিত্য, ইতিহাসও যা, Dating, Poker Playing, Minor Sports ও তাই। এই দৃষ্টি ভঙ্গীর আমেরিকাতে একটা নতুন নামকরণও হল—Scientism !

আমেরিকার বর্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে বিখ্যাত লেখক ও শিক্ষাবিদ স্টেফেন লীকক্ বলেছেন এই শিক্ষা হচ্চে শতকরা ১০ ভাগ সার বস্তু আর ৯০ ভাগ mixed wind and humbug। অধ্যাপক উডরিং উপরিউধৃত গ্রন্থে বলেছেন সে আমেরিকার বহু অভিজ্ঞ শিক্ষকদেরও এই এক মত। (পৃঃ ১৯৪)

কেউই অস্বীকার করবে না যে বর্তমান শিল্প-প্রধান জগতে পেশাদারী শিক্ষার বিশেষ প্রযোজন, কিন্তু সেটা সাধারণ শিক্ষাকে বাদ দিয়ে নয়। কিন্তু প্রগতিবাদীরা সাধারণ শিক্ষাকে বাদ দিয়ে বিকৃত পন্থায় পেশাদারী শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। আমেরিকার শিক্ষা তাই আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মস্তিস্ক ও নৈতিক চরিত্রকে বাদ দিয়ে handminded। আর একটি কথা এই যে, আমেরিকা পেশাদারী শিক্ষার উপর এত জোর দেওয়া সত্বেও সেখানে আজ সমগ্র পশ্চিম ইয়োরোপের মত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানীদের খুবই অভাব দেখা দিয়েছে।

আমেরিকার একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক রবার্ট হিচিন্‌স্ বলেছেন ঃ "The cults of scepticism, presentism, scientism and antiintellectualism will lead us to despair, not merely of education but also of society." (Education For Freedom, 1943, p. 38)

আমেরিকার গভীর শিক্ষা সংকট আজ তার সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে তা বারান্তরে আলোচিত হবে।

"Frustration and thwarted aspiration lead to the search for avenues of escape from a culturally induced intolerable situation ; or unrelieved ambition may eventreate in illicit attempts to acquire the dominant values. The American stress on pecuniary success and ambitions for all this invites exaggerated anxieties, hostilities, neuroses, and antisocial behaviour" (Robert. K. Merton',—American Sociological Review, Vol 3, 1938, p 680).

মনরোগের কারণনির্ণয় (২)

মনোবিদ

মনরোগের, বিশেষ করে, নিউরোসিসের কারণ নির্ণয়ে ভাববাদী মনস্তাত্ত্বিক ও মনরোগ-বিদ্‌দের মতামত শুধুই যে ভ্রান্ত তাই নয়, সমাজের পক্ষে ক্ষতিকরও বটে। পূর্ববর্তী সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই সব কাল্পনিক অন্তদর্শন-জাত তত্ত্বকথা উদ্দেশ্য-মূলক বা অজ্ঞানতাপ্রসূত এ নিয়ে তর্ক না করেও, একথা বলা চলে যে, আনুমানিক তত্ত্বকে তথ্য-সমর্থিত বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে প্রচার করার মধ্যে প্রচারকদের বিশেষ স্বার্থ জড়িত আছে। এরিক ফ্রম যখন বলেন ফ্যাসিজম বা কমিউনিজমের আসল কারণ মানবমনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, নির্ভরশীলতা বা স্বাধীনতা-বিতৃষ্ণা,—তখন সামাজিক দ্বন্দ্ব, ও অন্যায় অবিচার থেকে সাধারণের দৃষ্টি সরিয়ে আনার প্রচেষ্টা বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। যুদ্ধ বিগ্রহের আসল কারণ মানব মনের অন্তর্নিহিত ধ্বংসাত্মক বা আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি, একথা বলার মানে বিশেষ ধরনের দেউলিয়া সমাজব্যবস্থার পক্ষে ওকালতি নয় কি? যে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার ফলে শুধু পশুর মত কোনরকমে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে দিনরাত, যে ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা সংগ্রহের নিরঙ্কুশ অধিকার ও শোষণের অবাধ সুযোগ সুবিধা, সে ব্যবস্থায় মানুষের মনে—আক্রমণ বা ধ্বংসাত্মক ভাবের উন্মেষকে মনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি বলে চালানোর চেষ্টা শুধু ভুল নয়, রীতিমত অন্যায়। যাঁরা মানসিক রোগের চিকিৎসা করেন তাঁরা জানেন এই সব নিউরোটিক ভাবধারার জনক ও ধারক ও সমাজের উপরতলার শ্রেণী ও তাদের শোষণের সহায়ক মধ্যবিত্ত শ্রেণী; সমাজের শোষিত শ্রেণী এর জন্য দায়ী নয়। একজন আমেরিকান লেখক এই প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ—"The practices, ideas, morality and human relations that are destructive of people—and which ultimately are the cause of much mental illness—do not arise from the exploited class, the working people. They arise from the capitalist class and from the middle class to the extent that the latter aids, abets and shares in the exploitation of the working people." আর এক ধরণের বিভ্রান্তিকর প্রচার সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য মনে করছি। এই সমাজ ব্যবস্থায় সুস্থদেহী তবুদেখতে পাওয়া যায়, সুস্থমনা সত্যিই বিরল। তার মানে কিন্তু এ নয় যে,

এরা সবাই নিউরোটিক। নিউরোসিস শব্দটি বিশেষ অর্থব্যঞ্জক—এক ধরণের রোগ। সাময়িক-ভাবে মানসিক অস্থিরতা বা অশান্তি সকলেরই মনে দেখা দিতে পারে। বিশেষ কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে বা সমস্যার সম্মুখে অনেক সুস্থ ব্যক্তির মনও বিকল হতে পারে; আবার নিজেরই চেষ্টায় বা পরিবেশের পরিবর্তনে - মানসিক স্থিরতা ও সুস্থতা, স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। এদের নিউরোটিক আখ্যা দেওয়া অনুচিত। তাছাড়া এই বিপরীতধর্মী সমাজ-ব্যবস্থায় অল্পবিস্তর উৎকেন্দ্রিকতা (eccentricity) ও অবিবেচনাপ্রবণতা (irrationality) অধিকাংশ মনেই সঞ্চারিত ঃ এদের সকলকে নিউরোটিক ভাবলে ভুল হবে। সকলেই অল্পবিস্তর নিউরোটিক—এ প্রচার অভিসন্ধিপ্রসূত। যুদ্ধ বিগ্রহ, বেকারী, সামাজিক অন্যায়—এ সবের মূল নিউরোসিস্—এই প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব সপ্রমাণ এ-প্রচারের অভিসন্ধি। কার্যকারণ সম্পর্কের এই বিপরীত ব্যাখা সামাজিক ত্রুটীবিচ্যুতিকে দৃষ্টির আড়ালে রাখার এক হীন অপকৌশল মাত্র।

ফ্রয়েড প্রমুখ পণ্ডিতদের মন-রোগতত্ত্ব বিচারের আর একটি দিক আছে। ফ্রয়েডের মতে নিউরোসিসের কারণ মানসিক দ্বন্দ্ব। জীবনধর্মী ও মৃত্যুধর্মী প্রবৃত্তির সংঘাত থেকে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি—এই হল মূল তত্ত্ব। পরবর্তী কালে তিনি বলেছেন—নির্জ্ঞানমনসঞ্জাত সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে সামাজিক বিধিনিষেধের সংঘর্ষ থেকে মানসিক দ্বন্দ্ব তথা নিউরোসিসের উৎপত্তি। যেদিক দিয়ে বিচার করা যাক না কেন, দেখা যাবে ফ্রয়েডবর্ণিত এই সব প্রবৃত্তি অপরিবর্তণীয়; কাজেই সংঘাতজনিত দ্বন্দ্বও স্থানু এবং শাশ্বত। এ দ্বন্দ্বের নিরসন সম্ভব নয়, কেন না এ দ্বন্দ্ব অনঢ়। এই মনরোগতত্ত্ব রোগনিরাময়ের কোনও ব্যাখা দিতে অপারক। বস্তুতঃ ফ্রয়েড শেষ জীবনে এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলেন। চিকিৎসার ফলাফল সম্বন্ধে তিনি হতাশাই ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন নিউরোসিস্ সহজাত প্রবৃত্তিমূলক; আরোগ্যবিধি আমাদের আয়ত্তের বাইরে। (Sigmund Freud ; "Analysis, Terminable & Interminable" Collected Papers Vol v pp 354) অবশ্য অন্যত্র ("Civilisation & its Discontents" Hogarth Press, 1939) তিনি বলেছেন— যে সভ্যতা (?) নিউরোসিসের জনক এবং মানুষ যত সভ্য হতে থাকবে, নিউরো-টিদের সংখ্যা তত বাড়বে। বর্তমান সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ না করে, এধরণের উক্তি নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। তবুও এ উক্তির মধ্যে খানিকটা অবজেক্টিভ দৃষ্টি ভংগীর প্রকাশ আছে। কিন্তু মূলতঃ ভাববাদী দর্শন তাঁর ধ্যান ধারণাকে পুষ্ট করেছিল। কাজেই তাঁর মৌলিক তত্ত্বে অবজেক্টিভ কারণগুলোর আর সন্ধান মেলে না। জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব [Life Death Instinct] বা সুপারইগো-ইদের লড়াই—সব দ্বন্দ্বই তাঁর মতে ব্যক্তির গভীর মনো-রাজ্যের ব্যাপার; অন্তর্নিহিত অপরিবর্তনীয় সহজাত প্রবৃত্তির সংঘর্ষ। সামাজিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে সম্পর্ক কিছু নেই, বরং সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষই মানসিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। এ দৃষ্টি ভংগী বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভংগীর সম্পূর্ণ বিপরীত।

ফ্রয়েডের অনুগামীরা, বিশেষ করে হর্ণি, নিউরোসিসের কারণ নির্ণয়ে 'সামাজিক' এই বিশেষণটি নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। ফ্রয়েডের সহজাত প্রবৃত্তিমূলক দ্বন্দ্বকে নস্যাৎ করেছেন হর্ণি।

তাঁর মতে "The combination of many adverse environmental influences produces disturbances in the Child's relation to self and others. The immediate effect is what I have called the basic anxiety, which is a collective term for a feeling of intrinsic weakness and helplessness toward a world perceived as potentially hostile & dangerous. The basic anxiety renders it necessary to search for ways in which to cope with life safely. The ways that are chosen are those which under those given conditions are accessible. These ways, which I call the neurotic trends acquires a compalsory character." (New ways in Psychoanalysis, Kegan Paul, London, 1948 pp 276-77).

সরলার্থ এই রকম ঃ—শৈশবের প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নিজের ও অপরের মধ্যে অস্বস্তি জনক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়ঃ এর ফলে ঘটে মৌলিক উদ্বেগ। নিজের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও অসহায়তার দরুণ বিশ্বসংসারকে মনে হয় বিপদসংকুল ও শত্রুভাবাপন্ন। এই মৌলিক উদ্বেগ, এই দুর্বলতা ও অসহায়তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিবেশে যে উপায় হাতের কাছে পায় তাই আঁকড়ে ধরে—এইভাবে চরিত্রে নিউরোটিক ধারার বিকাশ ঘটে এবং এই নিউরোটিক ধারা ঐ ব্যক্তির পক্ষ হয়ে দাঁড়ায় অপরিহার্য। হর্ণির মতে নিউরোসিস মৌলিক উদ্বেগ থেকে পরিত্রাণের এক আবশ্যিক ও অনিবার্য পন্থা ; ধ্বংসাত্মক সমাজ ব্যবস্থায় অবস্থানের পরিণাম নয়। সমাজ শৈশবে শিশুকে একবারমাত্র ছুঁয়ে দিচ্ছে আর তার ফলে ঘটছে নিউরোসিস। পরবর্তীকালে চলছে শুধু মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ; উদ্বেগের আক্রমণ, সে আক্রমণের প্রতিরোধ—ইত্যাদি। ফ্রয়েড বলেছিলেন সামাজিক বাধানিষেধ সহজাত প্রবৃত্তিকে অবদমিত করার ফলে আন্তর্মানষিক যে ঘাত-প্রতিঘাতের সূত্রপাত—তার থেকে ঘটে নিউরোসিস। তত্ত্বের দিক থেকে, বিশেষ করে বিরোধকারী শক্তির অনড়তা ও অপরিবর্তনধর্মিতার দিক থেকে—এঁদের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই।

নিউরোটিক চরিত্রের বিশেষত্ব—বিরোধী ব্যক্তিত্বগুণের (contradictory personality traits) সমাবেশ অর্থাৎ তার স্ববিরোধী সত্ত্বা, ও আন্তর্মানসিক দ্বন্দ্ব (intrapsychic conflicts) —এই হল হর্ণির বক্তব্য। নিউরোটিক চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এ ধারণা নির্ভুল নয়। সুস্থ মানুষ কোনো ধ্বংসাত্মক বা আক্রমণাত্মক কাজ করে যতটা আত্মগ্লানি বা অনুতাপ বোধ করে, নিউরোটিক সমসময়ে ততটা করে না। স্ববিরোধী সত্ত্বার অস্তিত্ব সপ্রমাণিত হয় না, যখন দেখা যায় নিউরোটিক অতিমাত্রায় পর নির্ভরশীল ও বন্ধুভাবাপন্ন হতে পারে। যার উপর নির্ভর করছে বা যাকে বন্ধু ভাবছে তাকে ঘৃণা করছে না, শত্রু ভাবছে না। পরনির্ভরতা যতখানি, ততখানি আত্মনির্ভরতা তার মধ্যে বিরল। বরঞ্চ সুস্থ মানুষের মধ্যেই দেখি একই সময়ে অতিমাত্রায় ভালবাসবার ও ঘৃণা কববার ক্ষমতা, বন্ধুতা ও ক্রোধ প্রকাশের প্রবণতা। হর্ণি বলেন নিউরোটিকরা নাকি তাদের স্ববিরোধী সত্তা সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নয়। আমি দেখেছি নিউরোটিকরা অধিকাংশ সময়ে

তাঁদের বিরোধী মনোভাব সম্বন্ধে বেশীমাত্রায় সচেতন ঃ অন্ততঃ তাঁরা যে সুস্থ মানুষের চেয়ে বেশী আত্মকেন্দ্রিক—একথা সকলেই স্বীকার করবেন।

একজন মনরোগবিদের মতে—"The harsh realities of violence, exploitation & fear in our society that are reflected in neurotic consciousness, have completely disappeared from psychoanalytic theory" হর্ণির মত তথাকথিত সমাজসচেতন সাইকো-এ্যানালিষ্টেরও তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত অন্তর্দ্বন্দ, ও জিকিল হাইডের খেলায় পর্যবসিত। নিউরোটিকের মনে নাকি দুটি বিরোধী সত্তার সংঘর্ষ চলছে দিনরাত। একটি সত্তা ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন হয়ে আর একটি সত্তাকে গ্রাস করছে। "The God like being is bound to hate his actual being" রহস্যবাদীরা অনেকদিন থেকেই মানবমনে এই দেবাসুরের লড়াই দেখে আসছেন! নিও-ফ্রয়েডিয়ানরা তাঁদের থেকে বেশীদূর এগিয়েছেন কি ?

সমাজ ব্যবস্থার গলদ বা সংস্কৃতির সঙ্কট নিউরোসিসের কারণ—একথা এই সমাজ-সচেতন (?) মনোরোগবিদেরা মাঝে মাঝে বলেন বটে; কিন্তু সমাজ ব্যবস্থায় গলদ সত্যি-কারের কোথায়, সেটা দেখিয়ে দেবার এতটুকু আগ্রহ এঁদের আদৌ নেই। সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে কোথায় বিরোধ, কেন বিরোধ ? নিউরোটিকের চৈতন্যে সামাজিক কোন ভাবধারার প্রতিফলন, কি জন্য এই প্রতিফলন ? —এঁদের লেখার মধ্যে তার কোনই আভাস মেলে না। আগেই ফ্রমের কথা বলেছি। সমাজ ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে মানুষের অগ্রগতির সর্বপ্রধান হাতিয়ার বিজ্ঞান, বিশেষ করে আধুনিক যন্ত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাকে এঁরা আক্রমণ করে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এঁদের বিচার বিশ্লেষণে সেই ফ্রয়েডীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, মনের অপরিবর্তনীয় ত্রুটি বিচ্যুতি অথবা প্রবৃত্তিমূলক ভাবধারাই প্রাধান্য লাভ করেছে দেখতে পাই। সমাজ থেকে ব্যক্তিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে, তার নিজের সঙ্গে নিজের বিরোধের একটা কাল্পনিক তত্ত্ব এঁরা দাঁড় করাবার চেষ্টা করেন। আন্তর্মানবিক সম্পর্ক নয়, ব্যক্তির আন্তর্মানসিক সম্পর্ক বা সংঘর্ষ এঁদের কাছে বড় কথা হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথায় পর্যবসিত হয়। আসলে ফ্রয়েড ও নিওফ্রয়েডিয়ানদের মাধ্য তফাৎ শুধু মাত্র বাক্য বিন্যাসের ফ্রয়েডের "Life In tinct" ও হর্ণির "Real Self একই পদার্থ।

ফার্ষ্ট ও বাটলেটের [I. Furst. "The Philasophy of Freud" F H Bartlett, 'Sigmund Freud" (London, Gollnce 1938)] মতে সামাজিক মানুষ সম্বন্ধে ফ্রয়েডের কোনো ধারণাই ছিল না। সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য ফ্রয়েড ব্যক্তির অবচেতন মনে তলিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছেন। ধর্মশাস্ত্র এ উপদেশ অনেকদিন ধরেই দিয়ে আসছে। হর্নি, ফ্রম ও এই ধরণের কথাই বলেছেন। হর্নি, বলেছেন, The ideal is the liberation and cultivation of the forces whick lead to self realisation!" এঁদের ব্যক্তি কেন্দ্রিক চিকিৎসাপদ্ধতি সপ্রমাণ করে যে এঁরা সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণয়ে সত্যিকারের উৎসাহী মোটেই নন। সেই সনাতন আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মদর্শন ও ও আত্মোপলব্ধিই এঁদের ভরসা। হর্নির—

Neurosis & Human Growth এবং ফ্রমের "Man for Himself" পড়লে আর এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

এই প্রসঙ্গে ফার্ষ্টএর মতামত বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কেন না অনেকদিন তিনি সাইকো-এ্যানালিষ্ট হিসাবে প্রাক্‌টিশ করেছেন। "In contrast to the entire prycho-analytic tradition, with all the subjective, mystical and esoteric involvements that necessarily and demonstrably flow from it, I would say unequivocally that the determining contradiction of neurosis is not an internal, psychological & subjective one. It is an external contradiction. It lies in the neurotic's social practice." নিজের মনে নয়, বলেছেন ফার্ষ্ট, বিরুদ্ধে শক্তির সংঘর্ষ ঘটছে বাইরে, সমাজে। অবশ্য নিউরোটিকের অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, একথা ফার্ষ্ট বলেছেন না; তিনি বলেছেন, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। "The internal conflicts are reflections and derivations of the conflicts in his social practice and the latter express the contradictory human relations that are inherent in our social system". অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, লড়াই ও শ্রেণী সংগ্রাম আমাদের সমাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সব সময় বিদ্যমান! আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দিষ্ট হয় এই সংগ্রামে আমাদের বিশেষ ভূমিকা অনুযায়ী। এই সংগ্রামে নিজস্ব ভূমিকার সঠিক হদিশ না পাওয়ার জন্য নিউরোটিকের সামাজিক ক্রিয়া কলাপ ও ব্যবহারে দেখতে পাই বিচ্ছিন্নতা, উদ্দেশ্যহীনতা, সৃজনমূলক, গঠনমূলক কাজের প্রতি অনীহা; সুস্থ ব্যক্তি-সম্পর্ক-রক্ষা-ব্যাপারে অক্ষমতা। নিউর‍্যাসথেনিকের শারীরিক দুর্বলতার অজুহাতে নিশ্চেষ্টতা, সাইক্যাসথেনিকের অব্যবস্থচিত্ততা, ও দ্বিধা, হিষ্টিরিকের ভয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এ সবের মূলে আছে নিউরোটিকের পারিবারিক বা সামাজিক বিরোধের প্রতিফলন। এখানে মনে রাখা দরকার, মানুষের সব রকম আদর্শবাদ, মূল্যায়ন প্রচেষ্টা, উদ্দেশ্য, আবেগ, এক কথায় সব রকমের ধ্যানধারণার সৃষ্টি করে তার সমাজের বিশেষ অর্থনৈতিক বিন্যাস, দেশের রাষ্টনৈতিক ব্যবস্থা। অবশ্য ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, দেশের পুরনো সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারা কিছু পরিমাণে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে নিঃসন্দেহ। ব্যক্তিবিশেষের মানসিকতা শাশ্বত, সনাতন নয়, মনের অন্তর্নিহিত গুণ বা ধর্ম নয়; বিশেষ অবস্থা ও পরিবেশের ফল। সমাজ ব্যবস্থায় বিবদমান বহু শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকলে, বিভিন্ন ধরণের আদর্শবাদ মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা গড়ে উঠেবেই। বস্তুজগতকে, সমাজকে সম্যক্‌ভাবে বুঝতে না পারলে—অন্তর্জগতে বহির্বাস্তবের দ্বন্দ্বের প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু নিউরোসিস্ হবে কি হবে না, নির্ভর করবে ব্যক্তি বিশেষের নার্ভতন্ত্রের বিশেষ গঠন এবং এই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের গুরুত্ব ও মাত্রার উপর। আগামীবারে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনার ইচ্ছা রইল।

জনাতঙ্ক

অমিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

"ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও তার উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ"সমস্যা বর্ত্তমানে পৃথিবীর জটিল সমস্যাবলীর অন্যতম। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ নানা বিবদমান দলে বিভক্ত। গত পনেরো বছরে এ সম্পর্কে পৃথিবীর পত্র-পত্রিকায় যত লেখা বেরিয়েছে, তার সংখ্যা আগের ১৫০ বছরে প্রকাশিত এই সম্পর্কিত সমস্ত প্রবন্ধাবলির থেকে বেশী। এই সেদিন সম্মিলিত জাতি সংঘের দরবারে ১৯টি দেশের ১৫০ জন বৈজ্ঞানিক এই সমস্যাকে সাধারণ পরিষদে আলোচনার বিষয়সূচী করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। জে, দে, কাস্ত্রো, F. A. O এর ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট একজায়গায় বলেছেন, পৃথিবী ব্যাপী দারিদ্র্য আজ মানুষকে দুই দলে ভাগ করে দিয়েছে। একদল, প্রধাণতঃ অনুন্নত দেশের অধিবাসীরা—খাদ্যাভাবে কষ্ট পাচ্ছেন, অপরদিকে শিল্পোন্নত দেশের বাসিন্দারা যে কোনো মুহূর্ত্তে এই অনাহারী জনগণ বিদ্রোহ করতে পারে, এই ভয়ে নিদ্রাহীন রাত্রিযাপন করছেন। অবশ্য ফরাসী সমাজ বিজ্ঞানী আলফ্রেড সভির মতে উন্নত দেশের লোকদের বিবেকের দংশন বা ভয় এতটা তীব্র মনে করবার কোনো কারণ নেই। সাম্রাজ্যবাদী দেশের অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা এ সমস্যাকে পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনার থেকেও বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন। 'Mankind today is faced with two major threats to its continued existence. One is instant death by nuclear warfare. The other is paradox of a lingering death by an over abundance of life and the result of the uncontrolled growth of the world's population." [The New-York Times, Int. Edition. November 12, 1961].

জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে এই গ্রহের ক্যান্সার বলে বর্ণনা করাও হয়েছে। অবশ্য কথাগুলো খুব নতুন নয়। ১৭৯৮ সালে ম্যালথাসের 'Essay on the Principle of Population প্রকাশিত হবার পর থেকে এই ধরণের আতঙ্কবাদ নানাভাবে ছড়ানো হয়েছে। বর্তমানে আবার যারা এই আতঙ্কবাদ প্রচারে নেমেছেন মালথাস্‌কে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছেন, তাঁদের বক্তব্য ও প্রতিপক্ষের মন্তব্য এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করব।

এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে যে প্রশ্নটী প্রথম মনে আসে সেটি হ'ল এই, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির হার সমান তালে চলতে পারবে কি না? ২০০০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা কত হতে পারে? এ' বিষয়ে পণ্ডিতদের অভিমত

বিভিন্ন। জুলিয়ান হাক্সলী এবং গ্যাল্টন ডারউনের মতে প্রতিদিন ১ লক্ষ চল্লিশ হাজার করে লোক সংখ্যা বাড়ছে। ধরা যাক্ সংখ্যা ৩০০ কোটি থেকে বেড়ে ৭০০ কোটিতে দাঁড়াল। ম্যাল-থাসবাদীরা অবশ্য আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে শুধু সংখ্যাটার ওপরেই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অন্যান্য তথ্যকে আড়াল করে শুধু সংখ্যাটিকে বড় করে দেখানো উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে হয়। সভি এ সম্পর্কে কটাক্ষ করে বলেছেন, মাত্র ৮০ সেন্টিমিটার উর্বর জমির ওপর পৃথিবীর সমস্ত লোকের জীবনধারণ নির্ভর করেছে বললে আতঙ্কটা আরও বেশী প্রকট হয়ে ওঠে। এবার বিচার করে দেখা যাক্, ঐ সময়ের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন কতটা বৃদ্ধি পেতে পারে। ডারউইন, হাক্সলী প্রমুখ ম্যালথাসবাদীরা বলছেন, উৎপাদন দ্বিগুণের বেশী কিছুতেই হতে পারে না। মনে রাখা দরকার, বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক লোক অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে আছে। তা'হলে ৬০০ কি ৭০০ কোটির অন্নসংস্থান করতে গেলে ফলন চতুর্গুণ হওয়া প্রয়োজন। সে সম্বন্ধে কোনও ভরসাই এঁরা দিতে পারেন না। কিন্তু বৃটিশ ভূবিজ্ঞানী ডাড্‌লী স্ট্যাম্পের মতে বর্ত্তমান পদ্ধতিতে [অবশ্য আদিম পদ্ধতিতে নয়] চাষ করেও ২০০০ খৃষ্টাব্দে ১০০০ কোটি লোকের অন্ন সংস্থান করা যেতে পারে। জার্মান জনতত্ত্ববিদ্ বার্গো ডরফারও ঐ মত পোষণ করেন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক কলিন ক্লার্ক মনে করেন, ম্যাল-থাসবাদীরা ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা চালিত হচ্ছেন, জমির উৎপাদন ক্ষমতা পূর্ব নির্দ্ধারিত নয়। ৫০০ বছর আগে সমস্ত উত্তর আমেরিকায় মাত্র ১০ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। মাথা পিছু ৭॥ বর্গ মাইল জমি তাদের ভাগে পড়ত, তা সত্তেও খাদ্যাভাব দূর হত না। সে সময়ে ম্যালথাস জন্মালে নিশ্চয়ই বলতেন, উত্তর আমেরিকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি চরমে উঠেছে। এখন উত্তর আমেরিকার জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ কোটি এবং প্রফেসার স্পেংলারের মতে উত্তর আমেরিকা অন্তত ৬০ কোটি লোকের আহার যোগাতে পারে। যখন মানুষ শিকারলব্ধ আহার্যের ওপর নির্ভর করত, জনপ্রতি কয়েকশো একর জমিতেও তার খাদ্য সংকুলান হত না। এখন একজন আফ্রিকান চাষী (উৎপাদন ব্যবস্থা যাদের খুবই নিম্নস্তরের) মাত্র কয়েক একর জমিতে ১ জনের মত খাদ্য উৎপাদন করতে পারে আর আর ডেনমার্কের চাষীর (যাদের উৎপাদন ব্যবস্থা উচ্চ স্তরের) মাথাপিছু মাত্র ⅓ একর জমি লাগে, এর থেকেও পুষ্টিকর খাদ্য ফলাবার জন্য। ক্লার্কের মতে ডাচ পদ্ধতিতে চাষ করা হলে অন্তত ২৮০০ কোটি লোককে পেট ভরে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা যাবে। এর জন্যে বর্ত্তমান পৃথিবীতে যে পরিমাণ জমি চাষের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, তার থেকে বেশী জমি দরকার হবে না। জাপানী পদ্ধতিতে চাষ করলেও ২৮০০ কোটি না হোক্, অন্তত ২০০০ কোটির অন্ন সংস্থান হতে পারে। মনে রাখা দরকার, সব দেশেরই উৎপাদন পদ্ধতির ক্রমোন্নতি ঘটছে এবং প্রয়োগশালার ফলাফল থেকে বলা যায়, মাত্র ২৫ বর্গ মিটার জমিতে ১ জনের ১ বছরের মতন খাদ্য উৎপাদন চলতে পারে, অবশ্য যদি আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হয়। এ ছাড়া কৃষিগবেষকগণ অনুমান করেন, জমির ফলন-ক্ষমতার পুরোপুরি সুবিধা এখনও আমরা গ্রহণ করতে পারছি না। শুধু মরুভূমি নয়, উত্তর মেরুতেও খাদ্য ফলানো সম্ভব হয়েছে। এই সব বিবেচনা করলে ম্যালথাসবাদীদের বক্তব্য অসার ও শুধুমাত্র আতঙ্ক প্রসূত বলেই মনে হবে।

কথা উঠতে পারে, যেমন গ্যালটন ডারউন তুলেছেন—খনিজ দ্রব্যের বেলায় কি হবে? এ গুলো কি দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে না? ক্লার্ক বলেছেন, লৌহ ও এ্যালুমিনিয়মের উৎস অফুরন্ত। তাছাড়া যেভাবে ইঞ্জিনীয়াররা খনিজ ধাতুর বিকল্প দ্রব্য আবিষ্কার করে চলেছেন তাতে ডারউইনের ভীতি অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

খাদ্যদ্রব্য বা খনিজ দ্রব্য সম্পর্কে অন্তত কয়েক শো বছরের জন্য আমাদের উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। আগামী দিনের মানুষ যদি কোনদিন সত্যিই অসম জনসংখ্যাবৃদ্ধিসমস্যার সম্মুখীন হয়, তাদের সেদিনকার উচ্চতর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও প্রচুর অর্থসম্পদের সাহায্যে সে সমস্যার নিরসন তারা নিজেরাই করতে পারবে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আমাদের রোদন নিরর্থক।

এইবার সমস্যার আর একটি দিক। পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে তাল রেখে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয় বলে একদল অর্থনীতিক মনে করেন। বিশেষজ্ঞ-দের মতে শতকরা ১ ভাগ জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় আয়ের শতকরা ৪ ভাগ বিনিয়োগ প্রয়োজন। যে দেশে জনসংখ্যা বছরে শতকরা ৩ জন করে বাড়ছে, সে দেশের জাতীয় আয় ১২% বাড়লেও সে দেশের পক্ষে জীবনধারণের মনোন্নয়ণের জন্য অর্থবিনিয়োগের কোনও ব্যবস্থা থাকবে না। আমাদের দেশে ১৯৫৯ সালে কোল ও হুভার শিল্পোৎপাদনের উপদেষ্টা হয়ে আমেরিকা থেকে এসেছিলেন। তাঁরা বলেছেন, জন্মের হার অন্ততঃ ৫০% না কমালে আমাদের দেশে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব নয়। এঁদের সঙ্গে সকলে কিন্তু একমত নন। আসলে বাৎসরিক ২%এর বেশী জনসংখ্যার বৃদ্ধি অধিকাংশ অনুন্নত দেশে নেই এবং প্রফেসর সভির মতে জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগ বিনিয়োগই এদের পক্ষে যথেষ্ট। তাছাড়া এই সব দেশে শাসক শ্রেণীও পরগাছাদের জন্য যে ব্যয় হয়, তার অনেকখানির সংকোচন সম্ভব। অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণেও এদের কমখরচ হয় না। মানবতাবোধের দিক দিয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে এদের সাহায্যে এগিয়ে আসাও খুবই স্বাভাবিক। এই সব বিবেচনা করলে সমস্যাটির গুরুত্ব অনেকখানি কমে যাবে। ভারতের চাষী যদি জাপানী প্রথায় খাদ্য উৎপাদন করে, তাহলে আমাদের জনসংখ্যার চতুর্গুণের খাদ্যসংস্থান এখনই সম্ভব হয়। সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ, চাষীদের মধ্যে জমি বন্টন, জাতিভেদ প্রথার রহিত করণ ইত্যাদির সাহায্যে ভারতবর্ষে শুধু খাদ্যোৎপাদন নয়, শিল্পোন্নয়নও এমন হারে সম্ভব যাতে অতি শীঘ্রই উন্নত দেশগুলির কাছাকাছি আমরা পৌঁছোতে পারি। অন্ততঃ মার্কসবাদী অর্থনীতিকরা সেইরকমই মনে করেন। আমাদের দেশব্যাপী ক্ষুধার মূলে রয়েছে দেড়শো বছরের ইংরাজশাসন। জন্মনিয়ন্ত্রণকে কোনও সরকার রাষ্ট্রনীতি হিসাবে গ্রহণ করলে ভুল করবেন। এটা পরিবারের নিজস্ব সমস্যা হিসাবেই বিবেচিত হওয়া উচিত।

এ'ছাড়া জীবিকার মনোন্নয়নের আন্তরিক ও সামগ্রিক প্রচেষ্টা এমনভাবে সামাজিক পরিবর্ত্তন নিয়ে আসবে, যার ফল হবে সুদূর প্রসারী। আমাদের মতন অনুন্নত দেশের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারে আতঙ্কিত হবার কোনও প্রয়োজন নেই। সত্যিকারের বিপদ জনসংখ্যাবৃদ্ধি নয়, বিপদ যদি কিছু থাকে তা'হলে পুরনো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার অনুসরণ। ম্যালথাসের মত সংগঠনমূলক

কোনও পথ দেখাতে পারে না, বরং আমাদের লক্ষ্য বিপথে চালিত করে। অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমাজসংগঠনের কোনও হদিশ দেয়না এই মত। আমাদের প্রয়োজন জনগণকে ধনতন্ত্রের হাত থেকে বাঁচানো, ধনতন্ত্রকে জনগণের রোষ থেকে বাঁচানো নয়।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি সমাজের মঙ্গল বিধান করতে, সাধারণের সুখশান্তি আনতে সক্ষম হবে কি না, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে! জনসংখ্যা যতই বাড়বে, দেশের শাসনব্যবস্থা ততই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে, এ'ভয়ও একশ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখা দিয়েছে। লোকসংখ্যাবৃদ্ধি সামাজিক মঙ্গল সাধনে অক্ষম, এ প্রচার উদ্দেশ্য প্রণোদিত। একথা ঠিক, ভোটদাতার সংখ্যা অনেকগুণ বাড়বে। কিন্তু এতে তাঁদেরই ভীত হবার কথা, যাঁরা জনসাধারণকে বঞ্চিত করতে চান, তাঁদের ভোট কিনতে চান। এই ভোটকেনার স্বাধীনতাক্ষুণ্ণ হওয়াকে তাঁরা জনসাধারণের স্বাধীনতাসঙ্কোচন বলে মনে করছেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিষয়টি বিচার করলে দেখা যায় যে, জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে শ্রমবিভাগ আরও সুনির্দিষ্ট হয় ও দেশের নানাবিষয়ে, যথা পরিবহন, জলসরবরাহ, সাংস্কৃতিক ও শাসনবিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ব্যয় আপেক্ষিক ভাবে হ্রাস পায়। জনসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য যে স্বাধীনতা হ্রাস পায় তা মুষ্টিমেয়ের স্বাধীনতা। সমাজের কয়েকজন ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধির স্বাধীনতা, অপরকে শোষন করার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা হারাণোর জন্য আপশোষ কেন? জনসংখ্যাবৃদ্ধি প্রায়শঃই সমাজে নতুন বিধানব্যবস্থার উদ্দীপক। জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও সমাজিক অগ্রগতির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ম্যালথাসের মতানুযায়ী ফান্স লোকসংখ্যা কমাবার চেষ্টা করেছিল। তার ফলে সে দেশে উল্লেখ যোগ্য উন্নতি তো দেখা যায়ই নি, বরঞ্চ কুফলই দেখা দিয়েছে। এরও আগে আমরা দেখতে পাই, হল্যাণ্ড লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ উপকৃত হয়েছিল। অপর পক্ষে গ্রীস ও স্পেনের মত দেশ জনসংখ্যা হাসের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধ্যাপক ক্লার্কের মতে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা নৈতিক বিচারে খারাপ না হলেও, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতিক দিক থেকে অবিবেচনা প্রসূত। "The peoples on the other hand who courageously and intelligently face the challenge of population increase, will be rewarded by economic, political and cultural progress to an extent beyond any limits that we can now foresee."

হাক্সলির মতন জীববিজ্ঞানী জন্মগত অস্বাভাবিকদের (genetically subnormal) সংখ্যা বৃদ্ধির ভয়ে ভীত। মনোবিজ্ঞানীদের মতে ইউরোপে শতকরা ১০ জন মানসিক রোগে ভুগছে এবং এদের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। জন্মগতভাবে অক্ষম, অসুস্থ ও অস্বাভাবিকদের প্রজননের স্বাধীনতা থাকলে সারা ইউরোপ অচিরে উন্মাদাগারে পরিণত হবে, এ ভয়ও অনেকে পাচ্ছেন। এ সম্পর্কে এ্যারাব-ওগলির মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। ধরা যাক্ কোনও দেশের জন সংখ্যার শতকরার শতকরা ১০ জন জন্মগতভাবে অক্ষম, ২০ জন মাঝামাঝি ক্ষমতার, অধিকারী, আর ৭০ জন সক্ষম ও সুস্থ; আরও ধরে নেওয়া যাক্ অক্ষম গ্রুপের জন্মহার সুস্থগ্রুপের জন্মহারের দুইগুণ। প্রজনন সূত্র অনুযায়ী (সক্ষম ও অক্ষমদের বিবাহ সম্ভাবনার পরিসখ্যানানুগ হিসাব ধরেও) প্রথম দুটি গ্রুপের আনুপাতিক বৃদ্ধি তৃতীয় গ্রুপের তুলনায় কমে আসা উচিত। আজকের

মানসিক রোগের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুণ নয়, বায়োলজিক্যাল কারণের জন্য নয়, সামাজিক কারণের জন্য ; এই হচ্ছে এক শ্রেণী মনোবিজ্ঞানীর অভিমত। 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (natural selection) এক্ষেত্রে ঘটছে না বলে শোক না করে, মানবিক সম্পর্কের উন্নয়নের প্রচেষ্টা মানবজাতির পক্ষে বেশী হিতকর হবে।

এখন সমস্যার মূল সূত্রটি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। ২০০০ খৃষ্টাব্দে না হোক্ ২৫০০ খৃষ্টাব্দে বা ৩০০০ খৃষ্টাব্দে এমন সময় আসবে কি যখন এই পৃথিবীতে মানুষের দাঁড়াবার জায়গারও অভাব ঘটবে? জনসংখ্যা যদি প্রতি পঁচিশ বছরে দ্বিগুণ হয়, তবে আগামী পাঁচশ বছরে গাণিতিক হিসাবে জনসংখ্যা লক্ষগুণ বেড়ে যাবে। পদপিছু মাটীর আয়তন দাঁড়াবে ৪৫ বর্গ সেন্টিমিটার।

সমস্যাটি সম্পূর্ণ আনুমানিক, তা সত্ত্বেও এ নিয়ে পণ্ডিতরা ভয় পাচ্ছেন ও ভয় দেখাচ্ছেন। সত্যিই কি গাণিতিক নিশ্চয়তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অমোঘভাবে প্রযোজ্য? যুদ্ধ, মহামারী, মড়ক, অন্ততঃ বাধ্যতামূলক জন্মনিয়ন্ত্রণ না ঘটালে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে কয়েক শ' বছর পরে! —এ চিন্তা কি মানসিক সুস্থতার পরিচয়ক? এই বিষয় নিয়ে ষ্ট্রামলিন ১৯৬১ সালের 'নিউ টাইম্‌সের' কয়েকটি সংখ্যায় মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিবিধান, সত্যিকারের স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রীজাতির রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ, কর্মক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষের সমানাধিকার স্থাপন,—ইত্যাদি জন্ম মৃত্যুহারের মধ্যে সামঞ্জস্য এনে দেবে বলে ষ্ট্রামলিন মনে করেন। উপর্যুক্ত ব্যবস্থার ফলে স্বাভাবিকভাবে বিবাহ ঘটবে পরিণত বয়সেও পরিবারের লোকসংখ্যা হয়ে আসবে সীমিত।

মানুষের গড়পড়তা আয়ু বাড়ছে। এর মূলে আছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি, জনস্বাস্থ্যের দিকে সরকারী দৃষ্টি এবং সমাজতান্ত্রিক দেশে দারিদ্র্য ও বেকারীর ক্রম অবলোপ। ষ্ট্রামলিন বলছেন—"Yet, paradoxically enough, all this concern for the human beings increases the percentage of old people in the total population and consequently, it those age groups in which the death rate is highest. Therefore, the continuing decline in the death-rate is beginning to lag behind the decline in the birth-rate and the two will eventually even up." অর্থাৎ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গড়পড়তা আয়ু বাড়বে কিন্তু মৃত্যুর হার—জন্মহারের সমান সমান হয়ে আসবে। কেননা, মোট জনসংখ্যায় বৃদ্ধের সংখ্যা (যাদের মৃত্যুহার খুব বেশী) আনুপাতিক হারে অনেক বেশী বৃদ্ধি পাবে। জন্মের হার হ্রাস পাবে ; কেননা সন্তানধারণক্ষম নারীর সংখ্যা (১৫—৪৪ বছরের মেয়েরাই ধারণক্ষম বলে বিবেচিত) আনুপাতিকভাবে হ্রাস পাবে। ষ্ট্রামলিন দেখিয়েছেন ২৭৫ বছরের মধ্যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ৮ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে, আয়ুর গড় দাঁড়াবে ১৫০ বছর এবং এই সময়ের মধ্যে জন্মহার-মৃত্যুহারের সমতা আসায়, জনসংখ্যা হয়ে দাঁড়াবে নিশ্চল। এই হিসাবে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ১৫০০ কোটির বেশী

হবে না। প্রফেসর ক্লার্ক দেখিয়েছেন এই সংখ্যার অন্নসংস্থান বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থাতেই সম্ভব; একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। যেদিক দিয়েই বিচার করা যাক না কেন, প্রমাণ করা যায় যে, ম্যালথাসবাদীদের আতঙ্ক অমূলক। এঁদের ভয় অনেকটা সেই রূপকথার মহিলাটির মত যিনি গাছ থেকে পড়ে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হতে পারে ভেবে শোকে অধীর হয়ে পড়েছিলেন, সন্তান জন্মের আগেই। ম্যালথাসবাদীদের এই আতঙ্ক প্রচার মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি এনেছে, মানুষে মানুষে রেষারেষির ভাবকে বাড়িয়ে তুলেছে। কিন্তু এসমস্তই সাময়িক। প্রকৃতির সম্পদ-ভাণ্ডার অফুরন্ত। সমুদ্রের তলদেশ আজও অনাবিষ্কৃত। সেখানেও মানুষের খাদ্য-উপকরণ মজুত থাকতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। খাদ্য-উৎপাদনে বিজ্ঞানের সমস্ত জ্ঞান ও তত্ত্ব আজও অপ্রযুক্ত। উৎপাদন মানব জাতির প্রয়োজন অনুযায়ী হয় না, হয় ব্যক্তি-মুনাফার প্রয়োজনে। ম্যালথাস সামাজিক শোষণ ও অবিচারকে সমর্থন করবার জন্য এই মতবাদ গড়েছিলেন। আজ সাম্রাজ্যবাদী দেশে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তাই কবর খুঁড়ে ম্যালথাসকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টা চলেছে। বলা হচ্ছে যুদ্ধবিগ্রহ, সাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য, বেকারিত্ব—এসবের মূল কারণ দ্রুত জনংখ্যা বৃদ্ধি। শ্রেণীবিশেষের শোষণ ও অনাচারকে জনচক্ষুর অন্তরালে রাখবার এ অপচেষ্টা কিছুতেই সফল হতে পারে না। মানুষের বিজয়-অভিযানকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সাধারণ মানুষের শুভবুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে—তুলছে। হতাশাবাদের কুজটিকা দিয়ে শুভবুদ্ধির জ্যোতিকে নিস্প্রভ করা যাবে না। হাক্সলী-ডারুইনদের জনাতঙ্ক জনসাধারণকে সংক্রামিত করবে না।

তথ্যগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান মার্চ ২১, ১৯৫৯, ইউ, এস, নিউস্ এ্যাণ্ড ওয়ার্লড রিপোর্ট, ২৩শে নভেম্বর, ১৯৫৯, ফরচুন, ডিসেম্বর, ১৯৬০ ও নিউটাইমস্—৭ নম্বর, ১৯৬১—খুঁজলে মূল উপাদানগুলির সন্ধান মিলবে। আর উদ্ধৃতিগুলি গৃহীত হয়েছে "ওয়ার্লড মার্কসিষ্ট রিভিউতে আগষ্ট ১৯৬১তে প্রকাশিত—"Is there a danger of overpopulation" শীর্ষক প্রবন্ধটী থেকে।

মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে

এম্, ইয়ানোফস্কায়া

একশো বছর আগে শেচেনভ মস্তিষ্কের নিস্তেজনা ক্রিয়ার (Inhibition) স্বরূপ আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলেন। অখণ্ডনীয় যুক্তির সাহায্যে ইনিই প্রথম প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে মননক্রিয়া মস্তিস্ককোষের নিস্তেজনার ওপর নির্ভরশীল এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে দেহের অন্যান্য অংশের প্রক্রিয়ার মতই মস্তিষ্ক-প্রক্রিয়া সম্যকভাবে বোঝা যায়। এবং আরও বলেন চৈতন্য মস্তিষ্কের ওপর বহির্বাস্তবের প্রতিফলন।

কেন্দ্রীয় স্নায়ু-সংস্থায় কী ঘটছে (what) তার হদিশ শেচেনভ দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু কেন বা কীভাবে ঘটছে এর উত্তর তিনি দিতে পারেননি। কেন (why) ঘটছে—এ আবিস্কার করলেন পাভলভ। নানা ধরণের অবস্থায়, এমন কি যেখানে অবস্থা মোটেই অনুকূলে নয় সেখানেও মানুষ বা প্রাণী পরিবেশের সঙ্গে এমন সুন্দর, এমন উদ্দেশ্যমূলকভাবে কেন নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, পাভলভ তার ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হলেন। কিন্তু তিনি বিস্তারিতভাবে বলতে পারেন নি. কীভাবে (how) এমন ঘটে।

তখনকার দিনে স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপরত অবস্থায় মস্তিষ্ককে সরাসরি পর্যবেক্ষন করার কোন পদ্ধতি ছিল না। আর তা' ছিল না বলেই মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের দরুণ প্রতিটি মস্তিস্ক কোষের আকৃতিগত বা প্রকৃতিগত ঠিক কি ধরণের পরিবর্ত্তন ঘটে, সেটা জানতে পারা কারুর পক্ষেই সম্ভব হয়নি। আর তাই 'কী ভাবে' (how) এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারেন নি।

সাম্প্রতিক কালে রেডিও-বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন এবং গণিতবিদ্যার উন্নতির ফলে এই "কী ভাবের" উত্তর দেওয়া আজ অনেকখানি সম্ভবপর।

ক্রমশঃ করোটির কঠিন আবরণ ভেদ করে জ্ঞানালোকের রশ্মি আজ মস্তিষ্কের অন্ধকার গুহার অনেক স্থান আলোকিত করেছে। কোষের গঠন বিন্যাস, বিশেষ অবস্থান, পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে।

প্রায় সাঁয়ত্রিশ বছরের কঠোর পরিশ্রম, হাজার হাজার পরীক্ষা নিরীক্ষা (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যর্থতা সত্তেও) শতশত কর্মীর অদম্য উৎসাহ, অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি আজ প্রকৃতির এই গোপনতম রহস্যকে উন্মোচিত করেছে।

প্রাক্ পাভলভ যুগ পর্যন্ত কেউই সজীব মস্তিষ্কের ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা চালাবার সঠিক কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেননি। সেই জন্যে এযাবৎ দেকার্তের (Descartes) পরাবর্ত সম্পর্কিত ধারণাই বিজ্ঞানীদের মনে বদ্ধমূল ছিল। এই পরাবর্তক্রিয়াকে সম্যকভাবে অনুধাবন করতে বিজ্ঞানীরা সক্ষম হন নি। তাই কেন ও কী ভাবে—এই দুটি প্রশ্নের উত্তরই পাভলভ ও তাঁর উত্তরসূরীদের কাছে আমরা অত্যন্ত হালে পেয়েছি।

মস্তিষ্কে কোটি কোটি কোষের সমাবেশ। প্রতিটি কোষ হাজার হাজার কোষের সঙ্গে সংযুক্ত। প্রতিটি কোষ নিজের নিজের কাজ করে চলেছে। একটি কোষকে, মস্তিষ্ক থেকে বাইরে না এনে কী করে পরীক্ষা করা যায়, কী করে তার কার্যকারিতা অনুধাবন করা যায় এই ছিল এতদিনের সমস্যা। আনোখিনের ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল ল্যাবোরেটরিতে এই সমস্যার সমাধান ঘটেছে। খরগোসের মস্তিষ্ক কোষের একক ও স্বতন্ত্র ব্যবহার নিরীক্ষণ করার যন্ত্র এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

পদ্ধতিটি এই রকম: একটি খরগোসকে কুরারে (curare—পেশীকে অসাড় করার মতো এক রকম ওষুধ) ইঞ্জেকসন দিয়ে পরীক্ষাস্থানে নিশ্চলভাবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। গবেষক তার করোটিতে ড্রিল চালিয়ে একটি ছোট গর্ত করলেন ও তারপর এক মাইক্রন (micron) পরিধির একটি ইলেকট্রড গর্তে চালিয়ে দিলেন।

প্রথমে শোনা গেল একটা টিকটিক শব্দ; যখন ইলেকট্রডের ধারালো প্রান্তটি কোষের ভেতর প্রবেশ করলো তখন চিঁচিঁ শব্দ শোনা গেল। সব শেষে একটা শিসের শব্দ হোল। বোঝা গেল ইলেকট্রডটি কোষের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়েছে এবং আর একটি কোষের ঠিক প্রান্ত দেশে এসে উপস্থিত। এমনি করে যে কোন নির্দিষ্ট কোষবিশেষকে ইলেকট্রডের সাহায্যে পরীক্ষাধীনে আনা চলে।

স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়াশীল কোষ থেকে যে জৈব-বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চালিত হয় তাকে বিশেষ যন্ত্রের (oscillogram) সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা হয়। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে স্পন্দন রেখাও পরিবর্তিত হয়।

একটি ঘুমের ওষুধ (nembutal) দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খরগোসটি ঘুমিয়ে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে কোষের শব্দ থেমে গেল ও বিদ্যুৎ রেখায়নের রূপ পরিবর্তিত হল। ঢেউ খেলানো রেখার পরিবর্তে চিত্রে তখন দেখা গেল একটি সরল রেখা। সপ্রমাণিত হোল ওষুধটি কোষে প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে ইলেকট্রডে বদ্ধ কোষটির ক্রিয়া নিস্তেজিত হয়েছে।

এইভাবে মস্তিষ্কের কোন অংশে কোন ওষুধের প্রভাবে নিস্তেজনা নেমে এলো কিনা সঠিকভাবে বোঝা যেতে পারে।

এই পদ্ধতিতে গবেষণার ফলে আমরা অনেক কিছু নতুন তথ্য জানতে পেরেছি। আমরা জেনেছি বিভিন্ন কোষের ব্যবহারে ও জৈব বিদ্যুতের গতিবেগের তারতম্য আছে। কোন কোন কোষে সেকেণ্ডে দশ থেকে বারোটি স্পন্দন, আবার কোন কোন কোষে সেকেণ্ডে দুশো। বিভিন্ন

কোষনিসৃত শব্দও বিভিন্ন রকম। কোনটায় টিকটিক, কোনটায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ, কোনটায় কিচকিচ। আর এই প্রত্যেকটি শব্দই কোষগুলির বিভিন্ন ধর্ম ও কার্যকারিতার নির্দেশক। আরও জেনেছি মস্তিষ্ক কাণ্ডের (brain-stem) জালের মতো অংশে বহু ধরণের কোষ রয়েছে। মনে রাখা দরকার মস্তিষ্ক বল্কলের এই অংশটিকে আমরা বলি শক্তি উৎপাদনের কারখানা। কারণ এই অংশের উৎপাদিত নার্ভ শক্তির সাহায্যব্যাতিরেকে বহির্জগতের কোন উদ্দীপকের অনুভূতি লাভ করা সম্ভব নয়। আরও জানা গেছে বিভিন্ন কোষের ওপর রাসায়নিক দ্রব্যের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এইভাবে যখন বিভিন্ন কোষসমষ্টির বিশেষ বিশেষ ধর্মগুলি পুরোপুরি জানা যাবে এবং মস্তিষ্কের স্নায়ু-সংস্থার অন্যান্য অংশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সম্যকভাবে নিরূপিত হবে, তখন নিশ্চয়ই এমন রাসায়নিক দ্রব্য বা ঔষধ আমরা আবিষ্কারে সক্ষম হবো যা মস্তিষ্ক বা মনোরোগে প্রায় অব্যর্থ হবে। মস্তিষ্কের যে কোষসমষ্টির ওপরে আমরা এই ঔষধের প্রতিক্রিয়া ক্ষতিকারক মনে করবো সেই অংশকে আমরা অনাবাসে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারবো। চিকিৎসকরা শারীরতত্ত্ববিদ মারফৎ জানতে পারবেন তাঁর রোগীর মস্তিষ্কের ঠিক কোন কোষগুলি অসুস্থ এবং তার জন্য ঠিক কোন ঔষধটি ব্যবহার্য।

অবশ্য এটা খুব বড় কথা নয়। মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য এখনও অনাবিষ্কৃত সেই "ঠিক কী ভাবে" প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া।

কুকুরের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরেও এই মাইক্রোইলেকট্রড প্রবেশ করিয়ে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে। প্রফেসর আনোখিনের গবেষণাগারে ১৯৩৩ সাল থেকে শর্তাধীন পরাবর্তের জটিলতার ব্যাখ্যা খোঁজবার চেষ্টা চলেছে।

আনোখিনের একটি বিশেষ পরীক্ষানিরীক্ষার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। দু বছর ধরে ঘণ্টা বাজিয়ে আর বিস্কুট খাইয়ে একটি কুকুরের শর্তাধীন পরাবর্ত বজায় রাখা হয়। তারপর একদিন খাদ্যপাত্রে বিস্কুটের বদলে মাংস দেওয়া হয়। ঘণ্টা বাজানো হোল। কুকুর এগিয়ে গেল খাবারের থালার দিকে, মাথা নীচু করলো, তারপর হতাশায় মুখ ফিরিয়ে নিল। কুকুরের মাংসে অরুচি! তার লালা ঠিক মত নিসৃত হয়েছে, পাত্রের দিকে সে এগিয়েও গিয়েছিল—কিন্তু মাংস সে ছুঁলো না। স্বভাবতঃই কুকুরের মস্তিষ্কে দু বছর ধরে বিস্কুটের গন্ধ যে অনুসঙ্গ তৈরি করেছিল, মাংসের গন্ধের সঙ্গে তার কোন মিল ছিল না। তার আকর্ষণ শুধু ওই বিস্কুট জাতীয় খাদ্যেই সীমাবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু কথা হচ্ছে ঠিক কিভাবে কুকুর বুঝতে পারলো মাংসের উদ্দীপনা বিস্কুটের উদ্দীপনা থেকে আলাদা, ঘণ্টার আহ্বান বিস্কুট গ্রহণের—মাংস গ্রহণের নয়। অথবা অন্য কথায়, এই বিশেষ পরিবেশ বিস্কুটের পরিবেশ, মাংসের পরিবেশ নয়। কোন বিশেষ পরিবেশের সঙ্গে আমাদের নিজেদের মানিয়ে নেবার বিরুদ্ধে কী কাজ করছে? কিভাবে একে আখ্যাত করা যায়? আনোখিন নাম দিয়েছেন "এ্যাকসেপটর অফ এ্যাকসন"—বাংলায় বলা যায় কর্মের স্বীকারকর্তা। এ নিয়ে নানা রকমের গবেষণা হয়েছে এবং এর ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেছে যে এই, মস্তিষ্কের গূঢ় কার্যপ্রক্রিয়া প্রত্যেকবার তদানীন্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গে একসুরে বাঁধা হয়। গ্রাহী উত্তেজনা যখন

বহির্বাহী প্রতিক্রিয়ায় রূপান্তরিত হতে থাকে ঠিক সেই সময় প্রাণীর পূর্বঅভিজ্ঞতা অনুযায়ী এই "এক সুরে বাঁধা" কার্যটি সম্পন্ন হয়। এ পর্যন্ত বেশ বোঝা গেল ঃ কিন্তু ঠিক কোন পথ দিয়ে আমাদের গতি প্রকৃতির যাথার্থ্য নির্দেশকে সংকেতগুলি "কর্মের স্বীকার কর্তার" কাছে পৌঁছোয় ? আমরা জানি পরাবর্ত ক্রিয়ার তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বে গৃহীত উদ্দীপনার গ্রাহী নার্ভপথে সঞ্চালন, দ্বিতীয় পর্বে মস্তিষ্ক কর্তৃক এই উদ্দীপনা গ্রহণ ও তৃতীয় পর্বে পেশী সঙ্কোচন। এর মধ্যে তো কোথাও এই উদ্দীপনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার বা ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু বাস্তবে সংযত করার ব্যবস্থা রয়েছে দেখা যায়। যখনই গ্রাহী নার্ভ মারফৎ সাড়া জাগার সঙ্গেকার উদ্দীপনা নার্ভ কেন্দ্রে পৌঁছয়, তখনই কর্মের স্বীকারকর্তা (এ্যাকসেপটর অফ এ্যাকসন) এর মূল্য নিরূপণ করে এবং সংকেত দিয়ে জানিয়ে দিতে পারে উদ্দীপকটি সঠিক, না কোন ভুল হয়েছে, যা সংশোধন করতে হবে। আমাদের ব্যবহারের পরবর্তী ধাপ নির্ভর করবে এই নতুন অবস্থায় স্নায়ু কেন্দ্রে কী প্রতিক্রিয়া ঘটে তারপর। এইভাবে পরাবর্ত ক্রিয়ার চতুর্থ পর্বটি সংযুক্ত হয় ও বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থাকে বলা হয় "ফিড ব্যাক" (feed back) ব্যবস্থা।

এ ব্যবস্থা না থাকলে সতত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে কোন প্রাণীই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারতো না এবং তাদের অস্তিত্ব হয়ে উঠতো সঙ্কটাপন্ন। পুরনো অভ্যাসের বদলে নতুন অভ্যাস গড়ে তোলা সম্ভব হোত না। কোন কারণে যার পা কাটা পড়েছে সে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে শিখতো না। অসুস্থ ফুসফুসের বদলে সুস্থ যান্ত্রিক ফুসফুস দিয়ে কাজ চালানো যেত না। জীবনধারণের অবস্থার সামান্য বিপর্যয়েই মানবগোষ্ঠী ধ্বংস হোত। এখন আমরা আনাখিনের এই "চতুর্থ পর্ব" আবিষ্কারের ফলে অনেক কিছুর ব্যাখ্যা করতে পারি যা আগে পারতাম না। এখন আমরা বুঝতে পারি, কী করে মানুষ তার ভুল বুঝতে ও তা' সংশোধন করতে পারে, ঠিক কি করে পছন্দমত জিনিসটি খুঁজে পায় ; যখন আমরা একটা লম্বা বক্তৃতা করি—কথাগুলো কী করে ঠিকমত জিভের ডগায় এসে যায় এবং কী করে বাক্যগুলি বিশেষ অর্থবাঞ্জক হয়। কোন কাজ যাতে নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হয় তার বন্দোবস্ত স্নায়ুতন্ত্রে ঠিক করাই আছে। উচ্চতর-স্নায়ু-প্রক্রিয়ায় এ বৈশিষ্ট্য আমরা কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফলে লাভ করেছি।

কিন্তু এখনও এ সম্বন্ধে সবকিছু জানা যায়নি। এই "কর্মের স্বীকার কর্তা" কোষগুলি মস্তিষ্কের কোন স্বতন্ত্র ও বিশেষ কোষ সমষ্টি, না সময় বিশেষে সমস্ত কোষই এই রকম ব্যবহারের অধিকারী ? "ঠিক কী করে"—এই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার শারীরবৃত্ত সঠিক নিয়মকানুনের সবটুকু অবশ্য এখনও জানা যায়নি।

অন্য পথ দিয়ে জীবদেহের এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা অনুকরণ করেছেন এন, উইনার (N. Wiener) নামে একজন গণিতজ্ঞ। জীবদেহের স্বয়ংক্রিয়তা থেকে তিনি এই 'ফিড ব্যাক' ব্যবস্থা অনুমান করে নিয়েছেন। এর ফলে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানেব একটি নতুন শাখা (Cybernatics) এবং উদ্ভাবিত হয়েছে নানাবিধ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যার প্রয়োগে দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব সমাসন্ন।

[সবিতা মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত]

মানসিক শ্রমের বৈপ্লবিক রূপান্তর

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

সোভিয়েত ইউনিয়নের উক্রাইন রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের কোন এক জায়গায় একটি বাড়ীর সামনে এক ফলকের উপর লেখা আছে "বিব্লি ও টেলিকাস্ট"। সকাল থেকে দলে দলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সেই বাড়ীতে এসে হানা দেয় ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়। দূরভাষী টেলিফোন বুথের মত সারি সারি ঘরের মধ্যে ততক্ষণে আলো ফুটে উঠেছে নীলাভ টেলিভিশনের পর্দায়। কোনটিতে কোন কালজয়ী সাহিত্যিকের জীবনীর কয়েকটি পৃষ্ঠা ছাপার হরফে প্রতিফলিত, কোনটিতে বা সারি সারি গানিতিক সূত্র। সেই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে অদৃশ্য বক্তার কণ্ঠস্বর, যিনি ছাত্রদের কাছে সেই সূত্রগুলির ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যাখ্যা বৈদ্যুতিক ফিতায় রেকর্ড করে নেওয়া হচ্ছে।

কীয়েফ শহরে বিরাট গ্রন্থাগারের মত কোন প্রতিষ্ঠান গ্রামে নেই। সেই সব বড় বড় গ্রন্থাগারে এত বিষয়ে এত বই আছে যে বিভিন্ন লোককে তথ্য সরবরাহ করার জন্য শত শত কর্মীকে দিনের পর দিন অসংখ্য ক্যাটালগ ও কার্ড খুঁজে খুঁজে সেই সব তথ্য বার করতে হোত।

আজ সেখানে ইলেকট্রনিক মেশিন বসেছে যা তার স্মৃতির কোঠায় সাজিয়ে রেখেছে লক্ষ লক্ষ ফিতা রেকর্ড ও মাইক্রোফিল্মের সমস্ত তথ্য। হুকুম দিলেই সে নির্দিষ্ট ইলেকট্রনিক কোষটির সাহায্যে ফিতা রেকর্ড চালু করে, যার ফলে শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় পাঠ্য পৃষ্ঠাটির প্রতিকৃতি সুদূর গ্রামের টেলিভিশনে প্রতিফলিত করে। বিব্লিওটেলিকাস্ট কেন্দ্রের বিব্লিওটেক্নিসিয়ান হচ্ছে **নতুন যুগের গ্রন্থাগারিক**।

গল্প আছে একদিন এক যান্ত্রিক দাবাখেলোয়াড়ের সঙ্গে দাবা খেলতে বসে বহু যুদ্ধবিজয়ী নেপোলিয়ন খেলায় হেরে যান। পরে জানা যায় যে সেই যন্ত্রে নাকি একজন ক্ষুদে মানুষ লুকিয়ে থেকে তাকে হারিয়ে দেয়।

গল্প অবশ্য গল্পই, কিন্তু এই গল্পের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে মানুষের যন্ত্রকে দিয়ে মস্তিষ্কের কাজ করিয়ে নেবার স্বপ্ন।

মস্তিষ্কের প্রধান ক্ষমতা হচ্ছে স্মরণ শক্তি। গুরুমস্তিষ্ক বল্কলে হাজার হাজার প্রাথমিক ইউনিট বা নিউরণ আছে। সেগুলি দশ বিশ ত্রিশ বছরে কি পরিমান তথ্য স্মৃতির কোঠায় সঞ্চয় করতে পারে তার হিসেব করা সহজ নয়। কোন লোক যদি সেকেণ্ডে ২টি শব্দ হিসেবে ৫০ বছর

ধরে দৈনিক ১২ ঘণ্টা বই পড়ে, তাহলে তার পড়া হবে ১৫০ কোটি শব্দ যা মোটা মুটি ৩০০ পৃষ্ঠার ১৮০০০ বইএর সমান। এর বেশী মানুষের সাধ্যের বাইরে।

যে বিষয় নিয়ে আমি চিন্তা করছি সেটি শব্দের মাধ্যমে উচ্চারণ করতে যতটা সময় লাগে, ঠিক ততটা সময়েই বিষয় সম্পর্কিত ধারণাটি মস্তিষ্কের মধ্যে ধারা-বাহিক ভাবে সমবেত হয়ে প্রতিফলিত হয়।

বৈজ্ঞানিকরা এমন মেসিন তৈরি করার চেষ্টা করেছেন যা কোটি কোটি তথ্য স্মরণকক্ষে সঞ্চয় করে রাখতে পারে এবং সেগুলিকে মানব মস্তিষ্কের মত সারি বদ্ধ ও সমবেত ভাবে পুন: প্রকাশ করতে পারে, সেকেণ্ডে দুটি শব্দ বেগে নয়, তার হাজার হাজার গুণ বেশি বেগে।

আজ পর্যন্ত মানুষ ৫ কোটিরও বেশি ছাপা বই প্রকাশ করেছে। প্রতি বছর মোটামুটি ২ লক্ষ বই ও পত্র পত্রিকা ছাপা হয়। ৫ লক্ষাধিক বিজ্ঞানসাধক এবং লক্ষ লক্ষ ইঞ্জিনীয়ার ও যন্ত্রবিৎ মুদ্রিত তথ্যের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছেন। এই বিরাট বৈজ্ঞানিক তথ্যভাণ্ডার ভূগর্ভে নিহিত সোনা, হীরা ও ইউরেনিয়াম সম্পদের চেয়ে ও অনেক বেশি দামী। কিন্তু সেই বিপুল তথ্যভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিকাশ করে আনা সহজসাধ্য নয়। কারণ বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলবিদ্যার ক্ষেত্রে নিত্য নতুন উপক্ষেত্র, শাখা প্রশাখা, গজিয়ে উঠছে বলে বৈজ্ঞানিকরা ক্রমশই বেশি করে বিশেষজ্ঞতার দিকে ঝুঁকছেন। ফলে তাঁদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের পরিধি ক্রমশই সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে যাচ্ছে এবং সেই সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার পরিমাণ হু হু করে বেড়ে চলেছে বলে, এবই বৈজ্ঞানিক শাখার, উপশাখাপ্রশাখার বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যে দূরত্ব বা ব্যবধান তৈরি হচ্ছে, তা বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের পারস্পরিক দূরত্বের চেয়ে ও বেশি। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র যে ভাবে সুদূরপ্রসারী ও বৈভিন্ন্যময় হয়ে উঠেছে তাতে মেশিন ছাড়া সমস্ত রকমের তথ্য যোগাড় করা সম্ভব নয়। মেশিন না থাকার ফলে একাধিক জায়গায় একাধিক বৈজ্ঞানিক একই বিষয় নিয়ে গবেষণা করে সময়ের অপচয় করেন, কারণ তাঁরা জানতে পারেন না, অন্য কেউ সেই গবেষণা পূর্ব্বেই করেছেন কিনা। তাই আজ বৈজ্ঞানিকরা অনেক সময় বলেন যে, কোন একটি গবেষণা অন্য কোথাও অন্য কেউ করেছেন কিনা তার হদিস পাওয়ার চেয়ে নতুন কিছু একটা আবিষ্কার করা সোজা। গবেষণার এই ধরণের পুনরাবৃত্তি বৈজ্ঞানিক গবেষণার খরচ ও বাড়িয়ে দেয়।

আজকের দিনে রসায়নবিদ্যার কোন প্রয়োগিক সমস্যার সমাধান করতে গেলে সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক যৌগিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সমস্ত তথ্য হাতের কাছে চাই। বই পত্র ঘেঁটে লক্ষ লক্ষ যৌগিক প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে কোটি কোটি হরফ পড়া ছাড়া কোন উপায় নাই এক্ষেত্রে। সাধারণ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার সে কাজ করতে সক্ষম। এর জন্য চাই এমন ইনফর্মেশন মেশিন যার মধ্যে থাকবে কোটি কোটি ইউনিট। সেই রকম মেশিন আমাদের বলে দিতে পারবে :—

দেশবিদেশের বিশিষ্ট জলবায়ুতে ব্যবহারোপযোগী মেশিন তৈরি করতে হলে কোন কোন ধাতু

বা পদার্থ কি রকম পরিমানে মিশিয়ে সেই মেশিন গড়ার উপযোগী মিশ্র ধাতু বা প্ল্যাস্টিক তৈরি করতে হবে।

এক নতুন ধরণের ইন্ধনের জন্য কারা কার্বুরেটার তৈরি করে?

রকেট ইঞ্জিনের ইন্ধনের উপাদানগুলি কোন কোন জিনিষ থেকে পাওয়া যাবে?

স্বয়ংক্রিয় তথ্যযন্ত্র এবং স্বয়ংচালিত পরিভাষা, কোষবিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ বিশেষজ্ঞতা ও বিভাগীয়তা দূর করে বিজ্ঞানের পরস্পরসংলগ্ন ক্ষেত্র গুলিতে তথ্যসম্পদের কার্যকরী ব্যবহার সুনিশ্চিত করবে।

সোভিয়েত রাশিয়ায় এইদিক দিয়ে কাজ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। মস্কোতে বিজ্ঞান ও যন্ত্র কৌশলের এক তথ্যাগার আছে। পৃথিবীর ৮৫টি দেশ থেকে ৫০টি ভাষার প্রায় ৫০০ পত্রপত্রিকা সেখানে যায়। সেগুলির মর্মোদ্ধার করার জন্য তথ্যাগারে রয়েছেন ১৫০০ অনুবাদক এবং ১৩ হাজার উপদেষ্টা।

১৯৫৫ সালে সোভিয়েতবিজ্ঞানমন্দিরের পরিগণনা বিদ্যাভবনের কর্মীরা ইংরাজী থেকে রুশ ভাষায় তর্জমা করার জন্য 'বি-ই-এস-এম' মডেলের ইলেকট্রনিক কম্পিউটার (এই ধরণের একটি যন্ত্র কলকাতায় স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে আছে) ব্যবহার্য এক কর্ম্মসূচী রচনা করেন।

জার্মাণ ও ইংরাজী ভাষায় মোটামুটি ৪ লক্ষ করে শব্দ আছে। তার মধ্যে সর্ব্বদা ব্যবহার হয় ৫ হাজারের মত। গণিত ও যন্ত্রবিদ্যায় ব্যবহার্য শব্দের সংখ্যা আরো অনেক কম।

উল্লিখিত 'বি-ই-এস-এম' যন্ত্রটি ১৫২টি ইংরাজী ও ১৫৭২টি রুশ শব্দ নিয়ে সরল গাণিতিক পাঠ্য, টাইম্‌স্ পত্রিকার কিছু প্রবন্ধ এবং চার্লস ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড-এর কিছু কিছু অংশ তর্জমা করেছিল।

আজ সোভিয়েত বিজ্ঞান মন্দিরে ইংরাজী, রুশ, জার্মাণ, চীনা ও জাপানী ভাষা থেকে যন্ত্রানুবাদ করা হয় এবং হাঙ্গারীয় ও ফরাসী ভাষা থেকে অনুবাদ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই যান্ত্রিক অভিধানে বর্ত্তমানে ২৩০০ ইংরাজী শব্দ সংখ্যার আকারে সঞ্চিত আছে। আজ কোনো পাঠ্য অনুবাদ করার সময় প্রতি পৃষ্ঠায় ২।১টির বেশি যন্ত্রের অজ্ঞাত শব্দ পাওয়া যায় না।

এই স্বয়মানুবাদ তত্ত্বের নাম হয়েছে গাণিতিক ভাষাতত্ত্ব।

সোভিয়েত দেশে আজ এমন যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে যা চেঁচিয়ে পড়ে শোনাতে পারে। প্রুফ পড়তে ও কপি ধরতে পারে (মিনিটে ১২০টি শব্দ) সুদূর ভবিষ্যতে এই বেগ মিনিটে ৫০০।৬০০ শব্দে তুলে নিয়ে যাওয়া যাবে। সোভিয়েত দেশে প্রথম ইলেকট্রনিক স্বয়ংক্রিয়যন্ত্র নির্মিত হয় ১৯৪৫ সালে। তারপর ১৫ বছরের মধ্যে সেই যন্ত্রের যা উন্নতি হয়েছে তা অভাবনীয়। একটি উদাহরণ দিতে পারি।

যে কোন ছাত্রই জানে যে দুটি অজ্ঞাত মানসম্পন্ন সংখ্যার সমীকরণের সমাধান করতে ২।৩ মিনিট লাগে। কিন্তু এই রকম ২০০ সমীকরণ সিষ্টেমের সমাধানে এসে পৌছতে একজন মানুষের তার দশ লক্ষ গুণ বেশি সময় লাগবে অর্থাৎ ১২ বছর। যন্ত্রের কিন্তু এই সমাধানে পৌছতে ১ ঘণ্টাও

লাগে না। আগে এই সব যন্ত্র ঘণ্টায় ১ হাজারেরও বেশি কাজের ইউনিট করতে পারতনা। আজকাল করে ১০ হাজারেরও বেশি এবং অদূর ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ করতে পারবে।

এই সব যন্ত্রের সাহায্য আজকাল অসাধ্য সাধন করা যাচ্ছে এবং বহু টাকা বেঁচে যাচ্ছে। যেমন ধরুন কোন নদীর কিনারা এমন ভাবে বেঁধে দিতে হবে যাতে ধ্বসে না পড়ে। সেই বাঁধের গড়ন ও খাড়াই কেমন হওয়া চাই সেটার হিসেবে সামান্য ত্রুটী হলেই শ্রমিকরা হয়ত কয়েক শো গজ কাজ করে দেখলেন মাটীর গড়ন সেখানে আশানুরূপ নয়। ফলে কিছুদিন বাদে বাঁধে ফাটল দেখা দেবে এবং লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় হবে। কিন্তু তথ্যযন্ত্র থাকলে এই ধরণের গলতি হবেনা।

কোন্ এরোপ্লেনের ডানার গড়ন কেমন হওয়া দরকার, কোন্ মডেলের জেট-চালিত ইঞ্জিন দেখতে কেমন হবে; কোন টার্বাইনের পাখা গুলির চেহারা কিরকম হবে, এসবই যন্ত্র নির্ভুল ভাবে বলে দিতে পারে।

এখনো পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ইউনির্ভাস্যাল' মেশিন (যা বিভিন্ন রকমের কাজে ব্যবহার করা হায়) ব্যবহার হয়। কিন্তু সেগুলি বড় জটিল ও জবড়জঙ্গ। তাই সমগোত্রীয় সমস্যাবলীর জন্যে স্বতন্ত্র ও সরল মেশিন হলে কাজ আরো ভাল হবে।

কথাটা শুনতে খারাপ লাগে যে, গত ১০০ বছরে কারখানা শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তি বেড়েছে শতকরা ১৪০০ ভাগ, অথচ অফিস কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির মান শতকরা মোটে ৪০ ভাগ।

তবে আফশোষ করার কিছু নেই। এই অবস্থা বেশি দিন থাকবেনা। মাথার কাজের ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি।

অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসছে যখন মুদ্রিত সব কিছুই যন্ত্রের সাংখ্য বর্ণমালায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

কিন্তু মানুষ এবং তার মর্যাদা ? মানুষ মানুষই থাকবে। তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং কর্তৃত্ব মেশিন কেড়ে নিতে পারবে না। তথ্যযন্ত্র মানুষেরই হাতে গড়া। যন্ত্রের ভালমন্দ, উন্নত, অবনতি, সবই মানুষের ওপর। ট্রাকটার ও ব্লুমিং মিল যে ভাবে মানুষের কায়িক শ্রমের যন্ত্রীকরণ সাধন করেছে ঠিক তেমনি তথ্যযন্ত্র মানুষের মানসিক শ্রমের যন্ত্রীকরণ করবে।

অতীতে একদিন লিখিত ভাষা ও মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব যেমন আধুনিক মানব সভ্যতার ভিত্তি গেঁথেছে, ঠিক তেমনিই যান্ত্রিক ভাষা মানুষের মানসিক শ্রমের বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধন করে ভবিষ্যতের সমাজ ও সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে। এই যান্ত্রিক ভাষাই একদিন ঘুচিয়ে দেবে কায়িক ও মানসিক শ্রমের ব্যবধান।

প্রক্ষোভ

দোসেন্ত, পে, এম্, ইয়াকবসন

হাসিভরা মুখ। উজ্জ্বল চোখ দুটি। লোকটা বকবক করে কতো কথাই বলে সঙ্গী-সাথীদের কাছে। ওকে দেখি আর নানা কথা মনে আসে। হয়তো ওর কোন কাজ সফলভাবে শেষ করেছে তাই গল্প করছে। নয়তো বা বাড়ি থেকে বহুদিন পর পাওয়া চিঠিতে জেনেছে ওর অসুস্থ ছেলে ভাল হয়ে উঠেছে, তাই বলছে সঙ্গী-সাথীদের। কি জানি কি বলছে! যাই হোক, একটা কিছু হবে। দেখে মনে হয়, ওর মনটা খুশীতে ভরপুর।

এইভাবেই আমরা মানুষের মনোভাব অনেকটা বুঝতে পারি। তার চোখ-মুখ, তার কথা বলা, তার ভাব-ভঙ্গী দেখে আমরা তার অন্তরের আবেগ-অনুভূতির ভাষা 'পড়ে' নিতে পারি। ঐ লোকটাকে দেখে যেন মনে হল, তার মন আনন্দে ভরে রয়েছে। তেমনি কেউ যখন উদ্বিগ্ন থাকে, কি মানসিক অশান্তিতে থাকে, তাকে দেখেও আমরা তার মন বুঝতে পারি।

মনের প্রকৃতি বোঝা যায় তার কারণ, মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে শারীরবৃত্তিক নানা পরিবর্ত্তন ঘটে। মুখের বিভিন্ন মাংসপেশীর সঙ্কোচন প্রক্রিয়ায় যেমন সেই পরিবর্তনের ছাপ পড়ে, তেমনি সাড়া জাগে সারা দেহতেই। নাড়ীর গতি, শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরণ; রক্ত চলাচল, বিভিন্ন গ্রন্থির রসক্ষরণ ইত্যাদি সবই নানা ধরণের প্রক্ষোভের (Emotion) সঙ্গে বদলায়। সেই সঙ্গে মুখের ভাব, গলার স্বর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের ধরণও পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন প্রক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের পরিবর্তন যদি না ঘটত, যদি এগুলোর সাহায্যে মানসিক অবস্থার বিভিন্ন পরিবর্ত্তনকে সাধারণভাবে আমরা না বুঝতে পারতাম, তবে প্রক্ষোভের কোন মূল্যই থাকত না আমাদের কাছে।

প্রক্ষোভের সঙ্গে মানুষের স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এটা খুব খাঁটি কথা। মন্দই হোক আর ভালই হোক, অপ্রত্যাশিত কোন খবর অসুস্থ লোককে হঠাৎ দিতে নেই। খবরটা একটু একটু করে তাকে দিতে হয়, যাতে সে সেটা সয়ে নিতে পারে। রোগীর মানসিক চঞ্চলতা যাতে না ঘটে সে সম্বন্ধে ডাক্তাররা প্রায়ই সাবধান করে দেন। এমন কথা রোগীর কাছে কখনও বলা উচিত নয়, যা তাকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে।

মানুষের জীবনে বিভিন্ন প্রক্ষোভের গুরুত্ব অনেক। প্রক্ষোভ যদি আমাদের মধ্যে সাড়া না জাগাতো, তবে আমাদের জীবন একঘেয়ে হতো; নীরস মনে হতো। নিস্প্রভ হয়ে থাকতাম আমরা। প্রক্ষোভ আমাদের জীবনে নতুনত্বের স্বাদ আনে। দৈনন্দিনের একঘেয়েমি

দূর করে বৈচিত্র্য আনে জীবনধারায়। অনুভূতি যেখানে বেশী সদর্থক প্রক্ষোভ সঞ্চার করে, অর্থাৎ সুখ, আনন্দ, তৃপ্তি ইত্যাদি বোধকে জাগিয়ে তোলে, সেখানে মানুষের জীবন খুশীতে ভরে ওঠে। এমন মানুষ নানা আশা-আকাঙ্খায় তার মন ভরে তোলে, বিশ্বাসী হয় সুখী জীবন সম্পর্কে। আবার মানুষ যখন কেবলই প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়, অহেতুক তার মনে নানা উদ্বেগ দেখা দেয়। একটানা বহুদিন ধরে শোক-তাপ ভোগ করে, নিরাশ হয় নানা ব্যাপারে, তখন জীবনে আনন্দ থাকে না। বিষণ্ণতা মনকে ছেয়ে ফেলে। নিরাশা মানুষের মন ভেঙ্গে দেয়, তার উদ্যমকে নষ্ট করে ফেলে। মানুষকে জীবন-বিমুখ করে দেয়।

আঠারশ শতাব্দীর শেষের দিকে সমস্ত রকম প্রক্ষোভকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলা হয়। যেগুলোর প্রভাবে মানুষের জৈব প্রক্রিয়া উদ্দীপিত হতে দেখা যায় সেগুলোকে বলা হয় Sthenic Emotions; আর যেগুলোতে এই প্রক্রিয়ার অবনতি ঘটতে দেখা যায় সেগুলোকে বলা হয় Asthenic Emotion। আনন্দে আর দুঃখে মানুষের অভিব্যক্তি ও তার ব্যবহারিকরূপের বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রক্ষোভের এই শ্রেণী বিভাগ গড়ে তোলা হয়।

আনন্দকর প্রক্ষোভ মানুষের জৈব প্রক্রিয়াকে জোরালো করে। শ্বাস-প্রশ্বাস গভীরতর হয়, নাড়ীর স্পন্দনে কোন চঞ্চলতা থাকে না, নাড়ী পূর্ণভাবে স্ফীত হয়। চোখ-মুখ আরও উজ্জ্বল হয়, কোন ক্লান্তিবোধ থাকে না। কিন্তু দুঃখকর প্রক্ষোভের প্রভাবে মানুষের মুখ ম্লান দেখায়, শ্বাস-প্রশ্বাস হয় অগভীর, নাড়ীর গতিতে চঞ্চলতা বাড়ে, পূর্ণভাবে নাড়ী স্ফীত হয় না। ক্লান্তিতে সারা দেহ ভারী মনে হয়। নেপোলিওনের সার্জ্জন লারী এক সময় বলেছিলেন 'বিজেতাদের ক্ষত বিজিতদের ক্ষত থেকে দ্রুত নিরাময় হয়।' একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন তা' খুবই ঠিক। মহান অক্টোবর বিপ্লবের সময় আমাদের দেশেও এ ব্যাপারটা দেখা গিয়েছিল। যুদ্ধে প্রতিরোধমূলক অবস্থাকে কাটিয়ে উঠে, আমাদের সৈন্যরা যখন আক্রমণাত্মক পথ বেছে নিতে সক্ষম হয়, আর সেই সঙ্গে জয় সম্পর্কে বিশ্বাস ফিরে পায়, তখন অসুস্থ সৈনিকদের মধ্যে ব্যাপারটা পরিলক্ষিত হয়। সৈনিকদের মধ্যে দেহের ক্ষত-যন্ত্রনাকে সহ্য করবার ক্ষমতা বেড়ে যেতে দেখা যায়, আর তারা সুস্থও হয়ে ওঠে আগের থেকে আরও তাড়াতাড়ি।

বিভিন্ন প্রক্ষোভের প্রভাবে মানুষের দৈহিক প্রক্রিয়ায় কি পরিবর্তন ঘটে, এনিয়ে বর্ত্তমানে বহু গবেষণা চলছে। এই সমস্ত গবেষণা থেকে আমরা এসম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত বহু তথ্যাতথ্য জানতে পারছি। পাকস্থলীর মাংসপেশীর সঙ্কোচন প্রক্রিয়ার উপর প্রক্ষোভের প্রভাব সম্পর্কে অধ্যাপক কে, আই, প্লাতানভের গবেষণা এক্ষেত্রে খুবই চিত্তাকর্ষক। সম্মোহিত অবস্থায় মানুষের মনে বিভিন্ন ধরণের প্রক্ষোভ সঞ্চার করে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়। রণ্টজেন চিত্রে দেখা যায় আনন্দবোধক প্রক্ষোভের প্রভাবে পাকস্থলীর মাংসপেশীর দৃঢ়তা (tone) বৃদ্ধি পায়। এমনকি পাকস্থলীর আয়তন ও অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে যায়। আবার ঐ রকম সম্মোহিত অবস্থায় মনে দুঃখ বা হতাশাবোধক উগ্র ধরণের প্রক্ষোভ সঞ্চার করে দেখা যায় পাকস্থলীর মাংসপেশী শিথিল হয়ে পড়ে, যার ফলে সেটাকে একটা খালি ঝুলে থাকা থলের মত দেখায়। দেখা

যায় খাদ্যবস্তুকে অন্ত্রে ঠেলে দিতে পাকস্থলীর যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হচ্ছে। ভয়ের প্রভাবে শ্বাশ-প্রশ্বাসের হার কমে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাস অগভীর হয়। সেই সঙ্গে নাড়ীর গতি হয় মন্থর আর অনিয়মিত। এমনকি রক্ত ও প্রস্রাবের উপাদানের মাত্রায় তারতম্য ধরা পড়ে।

অবশ্য এসব পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা যাবে, যে প্রক্ষোভ নঙর্থক হলেই শরীরের ক্ষতি হবে। তার কারণ এ ধরণের পরীক্ষায়, খুব অল্প সময়ের মধ্যে মনে হঠাৎ একটা প্রক্ষোভের সৃষ্টি করে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়েছে। এইটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক, যে যথেষ্ট সময় পেলে দৈহিক প্রক্রিয়া ঐ সব প্রক্ষোভকে খাপ খাইয়ে নিতে পারতো।

এ প্রসঙ্গে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক জি, উলফের অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য। পুড়ে যাওয়ার পর তাঁর এক সহকর্মীর অন্ননালী সঙ্কুচিত হয়ে যায়। যার ফলে তাকে খাওয়ানোর জন্য পেট কেটে পাকস্থলীর ওপর অপারেশন করার প্রয়োজন হয়। এই সময় সরাসরি পাকস্থলীর ভেতর দিকটা দেখার তাঁর সুযোগ হয়েছিল। দেখা যায়, বেশ কয়েক সপ্তাহ নিদারুণ অসন্তোষ আর উদ্বেগের মধ্যে কাটানোর ফলে ঐ ভদ্রলোকের পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক পর্দার (mucus mumbrane) রং গাঢ় রক্তবর্ণ ছিল। এ্যাসিড ক্ষরণের মাত্রা অনেকটা বেড়েছিল। কিন্তু পরে যখন তিনি কিছুদিন নিশ্চিন্ত বিশ্রামের মধ্যে থাকলেন তখন এ্যাসিড ক্ষরণের মাত্রা দেখা গেল আগের থেকে শতকরা ৫২ ভাগ কমে গেছে।

একটানা দীর্ঘকাল আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থা ভোগ করছে, এমন মানুষের ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা করে আর ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা দেখেছেন যে, এই রকম অবস্থায় দেহের ওজন যেমন কমে যায়, তেমনি পরিণাম :ক্রিয়াতেও (metabolism) নানা গোলযোগ দেখা দেয়। এই রকম নানান তথ্য থেকে একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, নঙর্থক প্রক্ষোভের প্রভাব দীর্ঘকাল চলতে থাকলে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। রক্তের উচ্চচাপ জনিত অসুখে, বিশেষ করে যারা দুর্বলচিত্ত তাঁদের ক্ষেত্রে, চিকিৎসকরা অনেক সময় বৃত্তিপরিবর্ত্তনের উপদেশ দেন। সেই সমস্ত পরিস্থিতিকে তাঁরা এড়িয়ে চলতে বলেন, যা থেকে এইসব অসুস্থ ব্যক্তিদের অসন্তোষ, উদ্বেগ বা শান্তির বিঘ্ন ঘটতে পারে।

নঙর্থক প্রক্ষোভ স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে নানাভাবে। এমন কথা প্রায়ই শোনা যায়,—'সখ করে কি কেউ মনে অশান্তি, উদ্বেগ ডেকে আনে ! সকলেই জানে তা' ভোগ করতে কতো কষ্ট। কিন্তু কি করা যাবে, এ সব ত' হাওয়ায় উড়ে আসে না। জীবনে চলতে গেলে এমন বহু ঘটনাতেই জড়িয়ে পড়তে হয়, যা মনকে আঘাত করে। ঘটনা অপ্রীতিকর বলে ইচ্ছা করলেই ত' আর তাকে বদলান যায় না।' কিন্তু ব্যাপারটা পুরোপুরি ঠিক তা' নয়।

আমাদের নিজেদের উপরই অনেক কিছু নির্ভর করে। জীবনে একটা বড় আশা কি ভালবাসা ব্যর্থ হতে পারে। এ ঠিক যে 'জোর করে' কারুর প্রতি শ্রদ্ধা বা ঘৃণার ভাব আমরা মনে আনতে পারি না। কে, এস, স্তানিশ্লাভস্কি বলেছেন 'ফরমায়েস মত মনে প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয় না'।

কথাটা সত্য। কিন্তু চেষ্টা করলে মনের ভাবাবেগকে যে কিছুটা বদলান যায় না, এমন নয়। তবে তার জন্য একটু ঘুর পথে আমাদের যেতে হবে।

অনেক সময় দেখা যায় রোগী খুব কঠিন অসুখে ভুগছে, চিকিৎসকরা সেরে ওঠার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন, তবুও রোগী সেরে উঠেছে। এমন ব্যাপার হয় কি করে? এ সব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসা, বেঁচে ওঠার জন্য প্রবল ইচ্ছা, ভবিষ্যতের ওপর বিশ্বাস, আরও কাজ করবার আকাঙ্খা, রোগীকে রোগ জয় করতে সাহায্য করেছে। দুর্ব্বল দু'টি পায়ে ভর দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াবার আগ্রহ রোগীর মনে অত্যন্ত জোরাল ভাবে দেখা দেয় বলেই রোগকে সে জয় করতে পারে।

জীবনের প্রতি এমন সর্বজয়ী দুর্নিবার আকর্ষণ গড়ে ওঠে কি করে? মানুষ যখন জীবনকে ভালবাসতে শুরু করে, তার মনে যখন বিশ্বাস জন্মায় যে সমাজ তাকে চায়, তখনই সে এ ধরণের আকর্ষণ অনুভব করে।

সমাজ জীবনে যে আনন্দ বা যে সুখ, তার অব্যক্ত অনুভূতির স্বাদ যে পেয়েছে, তার মনেই এ ধরণের বিশ্বাস গভীর ভাবে দেখা দেয়। প্রতিদিনের জীবনে এই অপূর্ব অনুভূতিই তাকে প্রেরণা জাগায়, রাঙিয়ে তোলে তার প্রতিটি ঘটনাকে। এই থেকেই সে জীবনকে এমন গভীরভাবে ভালবাসতে শেখে। এই গোপন শক্তির বলে সে এমন স্থির বিশ্বাসী হয়ে ওঠে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

মহত্তর প্রেমের সুখ, সফল শ্রমের তৃপ্তি, উন্নত নীতিবোধের সার্থক প্রচেষ্টা, সুন্দর শিল্পকলা পরিদর্শনে মনের প্রফুল্লতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মনোরমতার উপলব্ধি—এ সব যে শুধু মানুষের মন অব্যক্ত প্রক্ষোভে ভরে তোলে তাই নয়, মানুষের জীবনবোধকেও বাড়িয়ে তোলে বহুগুণে। ১৮৫৭ সালে ই, এ, গণচারভ ই, লখোভস্কিকে এক চিঠিতে বই লেখার সময় তাঁর মানসিক অবস্থার কথা জানান। তিনি লিখেছিলেন "আমি ত' মরতে বসেছিলাম, সব শক্তিই ফুরিয়ে গিয়েছিল। কোন কিছুতেই আর কোন আকর্ষণ বোধ করতাম না। এমন কি আমার আগেকার লেখাগুলোর বহুল প্রশংসা আমার মনে কোন সাড়া জাগাতো না। আবার যে কোনদিন লিখতে পারবো মনে এ বিশ্বাসটুকুও ছিল না। কিন্তু হঠাৎ আবার লিখতে শুরু করলাম। কি খেয়াল হল—আবার লিখবো। এই ইচ্ছাটাকেই শুধু আঁকড়ে ধরেছিলাম। পাগলের মত পায়চারী করতে লাগলাম ঘরময়। তারপর এক সময় বেরিয়ে পড়লাম ঘর ছেড়ে। ঘুরে বেড়ালাম পাহাড়ে, মাঠে, বনে, জঙ্গলে। মন খুশীতে ভরে উঠলো। যৌবনের দিনগুলোতেও এমন কখনো হয়নি। গেল আট বছরের মধ্যে কিছুই লিখিনি। অথচ এতকাল পরে একমাসের মধ্যেই এই বইখানা লিখে ফেললাম। যদি জানতে চান কি করে পারলাম—খোলা হাওয়ায় থাকুন কিছুদিন। দিনে ঘণ্টা পাঁচেক কিছু না কিছু খাটাখাটুনি করুন, আর সাধারণ খাওয়াদাওয়া চালিয়ে যান। অবশ্য মদের নামগন্ধ একেবারে বাদ দিতে হবে, সে যে ধরণেরই হোক না কেন।"

আবেগ-অনুভূতির সাহায্যেই মানুষ তার প্রিয় জিনিসটা ঠিকমত বেছে নেয়। জীবনে এক বিশেষ মূল্যবোধ গড়ে ওঠে আবেগ-অনুভূতিকে কেন্দ্র করে। কথা হল জীবনের আনন্দ পেতে হলে,

সফেন মদের গ্লাস আর নিছক অলসতার মধ্যে তা পাওয়া যাবে না।

দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা মানুষের দেহ মন দুইই শুকিয়ে দেয়। বাস্তবই হোক আর কাল্পনিকই হোক, যে কোন ধরণের অসন্তোষ যদি মানুষ একটানা বহুদিন ধরে ভোগ করে ত', তার মনে বিকৃতি দেখা দেয়। তুচ্ছ ব্যাপারে হিংসা জেগে ওঠে, রাগ হয়, অল্পেতেই ঝগড়া-বিবাদ করে, অপ্রীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। যার ফলে তার গুণাবলি খর্ব্ব হয়, মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু এ অবস্থাতেও বদলান যায়, যদি কেউ নিজে সচেষ্ট হয়।

যে সমস্ত কারণ মনকে বিচলিত করে তোলে, সেগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দমন করা সম্ভব। এ ধরণের ভাবাবেগ মনে অশান্তি সৃষ্টির প্রধান উপাদান। অতএব মনে সদর্থক প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে হলে ঐ জাতীয় ভাবাবেগাদিকে প্রশ্রয় দিতে নেই।

বিশেষ করে যারা ভীরু প্রকৃতির বা অস্থির চিত্ত, কিংবা সারা মনে অহেতুক অশান্তি পুষে রেখেছে, তাদের এইভাবেই লড়তে হবে।

এক্ষেত্রে মনের ভাবাবেগ দমন করার চেষ্টা যত না করা দরকার, তার থেকে সফলভাবে বিভিন্ন কাজ করার মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে আস্থাবান হয়ে ওঠার চেষ্টা করা দরকার বেশী। সদা ভয় ভয় ভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার অর্থ এক অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক প্রক্ষোভের হাত থেকে রেহাই পাওয়া। মনের এই ভয় কাজকর্ম্মের মধ্যে দিয়েই তাড়িয়ে দেওয়া যায়। আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে হয়। মনে এই বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হয়, যে ভয়টা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অমূলক। মনের আতঙ্ক বেগকে দূর করা বা নিস্তেজ করে ফেলা যায় এইভাবে। যার ফলে মনে আবার শান্তি ফিরে আসে।

নঙর্থক প্রক্ষোভ মনে বেশীদিন ধরে জমে থাকলে স্বাস্থ্যের খুবই ক্ষতি হয়। চিকিৎসকরা রোগীদের প্রায়ই বলেন "যেসব পরিস্থিতিতে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে সে সব পরিস্থিতিকে এড়িয়ে চলুন। ছোটখাট ব্যাপারে উত্তেজনা দমন করবার চেষ্টা করুন।" অনেকে একথার ভুল অর্থ করেন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সজাগ হওয়া উচিত, উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়; অর্থাৎ যা মনে চঞ্চলতা আনতে পারে তা এড়িয়ে চলা উচিত—এধরণের চিন্তা থেকে তাঁরা প্রায়ই মনে এক ভুল ধারণা গড়ে তোলেন। তাঁরা অনেক সময় ভাবেন "তা হলে অপরের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা মনে আনাটা কখনই ঠিক নয়। কে কোথায় কি বিপদে পড়ল, কিংবা কার কি কষ্ট হচ্ছে—এনিয়ে আমার উদ্বিগ্ন হওয়া কি দরকার? অপরের ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবো কেন আমি? বরং আমার চেষ্টাটা হবে এই সব দুঃখ-কষ্ট যাতে আমাকে বিচলিত না করে।" তাঁদের ধারণা হয়, 'এইভাবে চললেই দেহ-মন দুইই বোধ হয় ঠিক থাকবে।'

এটা কিন্তু ঠিক নয়। স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য অপরের প্রতি উদাসীন হয়ে শুধু নিজের লাভ ক্ষতি ভালোমন্দর, পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু বিচার করার মত মনোভাব গড়ে তোলা একেবারেই উচিত নয়। মানুষ যদি পরস্পরের আবেগঅনুভূতির সঙ্গে পরিচিত না হয়, তবে জীবনের উত্তাপ সে অনুভব করে না। আত্মসর্ব্বস্ব যে লোক সে অতি দুর্ভাগা—মনটাই তার সঙ্কুচিত।

একঘেয়েমিজনিত বিরক্তি আর অতৃপ্তিতে ভরা। সে সুখ পায় না কখনও।

সদর্থক প্রক্ষোভ যখন মনে প্রফুল্লতা সৃষ্টি করে স্বাচ্ছন্দ্যবোধকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, তখন একথা বলাই বাহুল্য যে, ঐ ধরণের আত্মসর্বস্ব মনোবৃত্তি গড়ে না তুলে বরং সুখ বা তৃপ্তি পাওয়ার জন্য অন্যান্য প্রচেষ্টা করা দরকার। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজতে শুরু করে কোন দুঃখকে ডেকে আনা ঠিক নয়। ঐ ধরণের চিন্তা থেকে মানুষ সমাজবিমুখ হয়ে পড়ে। এরকম মনোভাব শেষ পর্যন্ত তাকে মানববিদ্বেষী করে তোলে। সদা আপন আপন চিন্তায় প্রথম দিকে কিছুটা আনন্দবোধ হয় ঠিক, কিন্তু শেষে ক্লান্তি দেখা দেয়, ক্লান্তিকর বিরক্তিতে মন ভরে ওঠে। তখন আর ভাল লাগে না। ক্রমশঃ সুখ বা আনন্দের প্রক্ষোভগুলো মনে স্তিমিতভাবে দেখা দিতে থাকে। জোর করেও আর সেগুলোকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয় না।

বিভিন্ন প্রক্ষোভের মধ্যে দেশপ্রেম সম্পর্কিত প্রক্ষোভ হল সব থেকে জোরালো প্রক্ষোভ। মানুষের মনে এ প্রক্ষোভ যে পরিমান আত্মবিশ্বাস বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে, ততটা আর কোন রকম প্রক্ষোভ পারে না। বিশ্বাস মানুষের মনে নানা সঙ্কট মুহূর্তে প্রেরণা দেয়, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করতে শক্তি জাগায়। শুধু তাই নয়, আত্মবিশ্বাসী মানুষের সাহচর্য বিপদের মুখে অপরাপর বন্ধুবান্ধবের মনে ভরসা এনে দেয়। সংগ্রামে তাদের ও জয়যুক্ত করে। বিশ্বাস মানুষের দুঃখ দূর করে, মনে সুখ-শান্তি আনতে পারে। বিশ্বাসের মত মূল্যবান কিছু নেই। দৈনন্দিন জীবনে মানুষে মানুষে বিশ্বাস, পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব, দেশে দেশে নানা জাতের, নানামতের মানুষকে এক করে দেয়। মানুষ এক হয়ে সংগ্রাম করে আরো ভালোভাবে জীবন যাপন করার জন্য। পৃথিবীতে জীবনকে আরও সহজ করে তোলার জন্য দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, বন্ধুত্ব দৃঢ়তর করার বাসনা মানুষের মনে দেখা দেয়। বিশ্বাস গড়ে তোলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি, আনে শক্তি, সুখ, শান্তি, উজ্জল ভবিষ্যৎ।

এইভাবেই বিভিন্ন প্রক্ষোভ মানুষের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। অতএব চেষ্টা করা উচিত ঈর্ষা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি নিকৃষ্ট প্রক্ষোভকে মন থেকে দূরে সরিয়ে সত্যকার মানবিক আত্ম-মর্যাদাবোধ গড়ে তোলা। মানুষের প্রতি প্রেম, ভালবাসা থেকেই মনে উন্নত প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয়। সুখের উৎসই হল এই উন্নত প্রক্ষোভ। সুখী জীবন গড়ে তোলার এইই ঠিক পথ। গঠনমূলক কাজের প্রচেষ্টা, মহত্তর প্রেমের আকাঙ্খা, সখ্যতা, মানুষের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেলামেশা, মধুর পারিবারিক পরিবেশ, এসবই মানুষকে তার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সংগ্রামে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। জীবনের প্রতি আকর্ষণ বাড়ায়। বিপদের মুখে তাকে সাহস এনে দেয় মনে। রোগীর ক্ষেত্রে এই মনোভাব বিশেষ সাহায্য করে রোগশয্যা থেকে আবার উঠে দাঁড়াতে।

[দোসেন্ত পে. এম ইয়াকবসন কত্তৃক লিখিত "শীলা এমোসী" প্রবন্ধের অনুবাদ। প্রবন্ধটি 'জদরোভিয়া' পত্রিকার ১৯৫৭ সালের ৭নং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রুষভাষা থেকে অরুণ চক্রবর্তী কর্ত্তৃক অনূদিত।]

শিল্পধর্মী ও চিন্তাধর্মী মস্তিষ্ক সম্পর্কে

আই, পি, পাভলভ

নিউরোলজিকাল ক্লিনিকে মনোরোগীদের বিশ্লেষণ করার সময় আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে মানুষের মনোবিকারের দুইটি বিশিষ্ট রূপ আছে—একটি হল হিষ্টিরিয়া এবং অন্যটি সাইকাস্থেনিয়া। মানুষের উচ্চতর স্নায়ু প্রক্রিয়ার ধরণ দুই প্রকার। এক শিল্পধর্মী এবং দ্বিতীয় চিন্তাধর্মী। এই দুইধর্মী মস্তিষ্ক ক্রিয়ায় সংগে আমার মনোবিকার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর উচ্চতর স্নায়ু প্রক্রিয়া মনুষ্যেতর প্রাণীর (যারা বহির্বাস্তবকে কেবল মাত্র গ্রাহীকেন্দ্র গৃহীত অনুভূতির সমষ্টিরূপে উপলব্ধি করে) উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়ার সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবিশিষ্ট এবং উপমেয়। অপর শ্রেণীটী দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রকে ব্যবহার করে। এইরূপে পশু মস্তিষ্ক এবং ভাষাক্ষম এক সম্পূর্ণরূপে মানবিক অংশের সমন্বয়ে মানবমস্তিষ্ক গঠিত এবং এই দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রই মানবজীবনকে প্রভাবিত করছে। কোন বিশেষ প্রতিকূল পরিবেশে যখন স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে, মস্তিষ্কের এই জন্মপূর্ব্ব বিভাজন নতুনতর আকার গ্রহণ করে। সম্ভবতঃ সেই অবস্থায় কেহবা প্রধানতঃ প্রথম সাংকেতিক তন্ত্র ব্যবহার করে, কেহ করে দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র এবং এভাবেই মানবপ্রকৃতিকে বিশুদ্ধ শিল্পধর্মী ও চিন্তাধর্মী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে।

প্রতিকূল পরিবেশে যখনই এই পার্থক্য তীক্ষ্ণতর হয়, তখনই জটিল উচ্চতর মানবিক স্নায়ু-ক্রিয়ার ব্যাধিগ্রস্থ প্রকাশরূপে আবির্ভাব হয় উৎকট শিল্পী ও উৎকট চিন্তাশীল ব্যক্তির (exaggerated artists and exaggerated thinkers)। প্রথমটির সংগে হিষ্টিরিয়া গ্রস্থ রোগীদের এবং দ্বিতীয়টির সংগে সাইকাস্থেনীয় রোগীদের সম্পর্ক আছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যাপনের অক্ষমতা এবং নিষ্ক্রিয়তার দিকদিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ ব্যক্তির তুলনায় সাইকাসথেনীয় ব্যক্তি বিশেষভাবে দুর্ব্বল। এই তত্ব বাস্তব তথ্যের দ্বারা সমর্থিত। অনেক হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ ব্যক্তিই সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ সেই হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ মার্কিন মহিলাটির' কথা বলা যায়, যিনি এক নতুন ধর্মমত প্রচার করে ও প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জন করে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। অন্যদিকে সাইকাসথেনীয় ব্যক্তিরা শুধুই বাকসর্ব্বস্ব ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবনসংগ্রামের অনুপযুক্ত এবং একান্তভাবে অসহায়। অবশ্য হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেকের ক্রিয়াকলাপ এত বিশৃঙ্খল যে, তারা জীবনে সঠিক স্থান নিবাচনে অক্ষম হয়ে নিজেদের সংগে অপরকেও বিড়ম্বিত করেন।

কিন্তু জন্তুদের সম্পর্কেও কি একথা প্রযোজ্য ? — সংগতভাবেই আমি এই প্রশ্ন করতে

পারি। পশুর মধ্যে সাইকাসথেনীয় টাইপ থাকা সম্ভব নয়; কারণ এদের মধ্যে দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র অবর্ত্তমান। মানুষের সবরকমের জটিল সম্পর্ক সমূহ সমর্পিত হয়েছে তার দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রে। ভাষাগত ও বিমূর্ত্ত চিন্তা তার মধ্যে প্রসার লাভ করেছে। প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রই মানবিক সম্পর্কের আদি ও স্থায়ী নিয়ামক। কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণীতে এরূপ কোন তন্ত্র অবর্ত্তমান। তাদের সমগ্র উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়া প্রথম সাংকেতিক তন্ত্রেরই অন্তর্গত। মানুষের মধ্যে দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র, প্রথম সাংকেতিক তন্ত্র ও নিম্নমস্তিষ্কর (Sub-corex) উপর দুভাবে প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমতঃ নিস্তেজনা (inhibition) দ্বারা এই নিস্তেজনাক্রিয়া দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রেই বিশেষভাবে বিকাশলাভ করেছে। নিস্তেজনা নিম্নমস্তিষ্কে অবর্ত্তমান অথবা প্রায় অবর্ত্তমান এবং প্রথম সাংকেতিক তন্ত্রে অপেক্ষাকৃত কম বিকাশ প্রাপ্ত। দ্বিতীয়ত আরোহবিধি অনুযায়ী (law of induction) সদর্থক ক্রিয়া দ্বারা। মানবিক ক্রিয়াকলাপ প্রধাণতঃ মস্তিষ্কের বাচনক্ষেত্রে (region of speech) অর্থাৎ দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রে কেন্দ্রীভূত; এই তন্ত্রের আরোহ নিশ্চিতরূপে প্রথম সাংকেতিক তন্ত্রে এবং নিম্নমস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।

নিম্নতর প্রাণীর ক্ষেত্রে ঐরূপ সম্পর্কের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রথম সাংকেতিক তন্ত্রের নিস্তেজনা ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়লে, এই রকমটী ঘটতে পারে। (নিম্নতর প্রাণীতে প্রথম সাংকেতিক তন্ত্রেয় স্থান নিম্নমস্তিষ্কের উর্দ্ধে।) পশুদের ক্ষেত্রে প্রথম সাংকেতিক তন্ত্রই নিম্নমস্তিষ্কের নিয়ামক হওয়ায় হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ ব্যক্তির অনুরূপ অবস্থার উৎপত্তি সম্ভবপর। পশুর প্রথম সাংকেতিক তন্ত্রে নিস্তেজনা ক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়লে নিম্নমস্তিষ্কেতীব্র উত্তেজনা ঘটে এবং প্রাণীর কার্যকলাপ বহির্জাগতিক উদ্দীপকের অনুশাসন মেনে চলে না। এজন্য পশুদের মধ্যেও হিষ্টিরিয়ার অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। মানুষের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র প্রথম সাংকেতিক তন্ত্র এবং নিম্নমস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু পশুদের বেলায় কেবল-মাত্র প্রথম সাংকেতিক তন্ত্রই নিম্নমস্তিষ্কবে প্রভাবিত করে। মূলগতভাবে পার্থক্য না থাকলেও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিস্তেজনার উৎস মাত্র একটী আর প্রথম ক্ষেত্রে দু'টী উৎস বর্ত্তমান।

আমি যখন কুলতুসীতে (kultushi) অন্যতম কুকুর 'ভার্ণীর' উপর পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছিলাম তখন এই চিন্তা আমার মনে আসে। ভার্ণী ছিল সত্যই একটি উগ্র ও হিংস্র প্রকৃতির কুকুর এবং আদর্শ প্রহরী কুকুরের গুণসম্পন্ন। পালক ভিন্ন কাউকে সে কাছে ঘেঁসতে দিত না। তার মধ্যে খাদ্য বিষয়ক এক তীব্র পরাবর্ত্ত লক্ষিত হত। দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত আমরা তার মধ্যে স্থায়ী বা অস্থায়ী কোন শর্ত্তাধীন পরাবর্ত্ত (conditioned reflex) প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হইনি। নপুংসক (castrated) কুকুরের মধ্যেও এম, কে,[২] অনুরূপ অবস্থা লক্ষ্য করেছিলেন: উদ্দীপকের মাত্রা বা তীব্রতার আনুগহীনতা, পার্থক্য নির্ণয়ের অক্ষমতা, ও প্রায়শঃ অতি স্ববিরোধী অবস্থা (ultra-paradoxical phase)

এক্ষেত্রে শর্ত্তাধীন উদ্দীপকের একক কার্য্যকালে পরাবর্ত্ত ক্রিয়ার গতিপ্রকৃতিও বিশেষভাবে

চিত্তাকর্ষক। প্রথম পাঁচ সেকেণ্ড কুকুরটির অপর্যাপ্ত লালা নিঃসরণ হতে থাকে এবং পরবর্ত্তী পাঁচ সেকেণ্ডে এই নিঃসরণ একেবারে স্থগিত থাকে। আমি একথা বলতে প্রস্তুত যে এটি একটি হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ কুকুর, যার স্নায়ুজাল এবং নিম্নমস্তিস্কের শক্তিনিয়ামক প্রথম সাংকেতিক তন্ত্র একান্তভাবে দুর্বল। এখানে সাংকেতিক তন্ত্রের ক্রিয়া ও নিম্নমাস্তিস্কের প্রক্ষোভসমষ্টি পারস্পরিক যোগাযোগরহিত ও সম্পর্কহীন।

আমার উক্তির স্বপক্ষে আরও বলা যায় যে ব্রোমাইড প্রয়োগে প্রথম সাংকেতিক তন্ত্রে নিস্তেজনা বৃদ্ধি করার ফলে কুকুরটির ব্যবহারে শৃঙ্খলা স্থাপিত হতে শুরু হয়। ৬ গ্রামের একমাত্রা ব্রোমাইড প্রয়োগে বিশৃঙ্খলার বহুলাংশে নিরসন ঘটল।

কাজেই ভার্ণীকে একটি হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ কুকুর বলে ধরে নেয়া যায়; নিম্নমস্তিস্কের প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট শক্তি থেকে সে বঞ্চিত।

১ Mary Becker Eddie—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "খৃষ্টিয় বিজ্ঞান" নামে এক প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্‌গাতা।

২ Maria Kapitonovna Petrova—ষ্ট্যালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন বিশিষ্ট সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক ও পাভলভের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

[পরিতোষ গুপ্ত অনূদিত]

মনের কথা

(২)

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মানুষের আসল বৈশিষ্ট্য বোঝবার জন্যে প্রাণীজগতে আজো যারা মানুষের নিকটতম আত্মীয় তাদের সঙ্গে মানুষের কয়েকটি তফাৎ বিচার করা যাক। এ-ধরনের আত্মীয় বলতে আধুনিক বনমানুষ ওরাং ওটাং, সিমপাঞ্জী, গিবন। মানুষের তুলনায় এদের হাতগুলো অনেক বেশি লম্বা, পা গুলো বেঁটে বেঁটে। আবার, মানুষের পায়ের চেটোটা অনেক থ্যাবড়া, বনমানুষদের তুলনায় পায়ের আঙুলগুলো অনেক ছোট ছোট। কিন্তু এসব তফাত অনেক পরে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ, আধুনিক মানুষ আর আধুনিক বনমানুষ যে-আদিম বনমানুষদের বংশধর তাদের দেহগড়নে এসব লক্ষণ ছিল না—তাদের হাতজোড়াও আধুনিক বনমানুষদের মত অমন লম্বা নয়, তাদের পায়ের চেটোও আধুনিক মানুষদের মত থ্যাবড়া আর ছোট-আঙুল-যুক্ত নয়। আদিম বনমানুষদের যে-সব বংশধর গাছের বাসা ছেড়ে সমতল জমিতে নেমে এসেছিল—সমতল জমির উপর চলতে চলতে তাদের পায়ের চেটোগুলো এই রকম থ্যাবড়া আর পায়ের আঙুলগুলো এরকম ছোট ছোট হয়ে এসেছে। অপর পক্ষে, যে-সব বংশধরেরা গাছের জীবন ছেড়ে আসেনি গাছে থাকতে থাকতে—গাছের ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে—কিংবা, যা একই কথা, ঘোরাফেরা বা চলাচলির কাজে হাত জোড়াকেই অমনভাবে ব্যবহার করতে করতে—তাদের হাতগুলো এরকম লম্বা-লম্বা হয়ে গিয়েছে।

প্রমাণ দেখা যাক। কেনিয়ায় এক রকম খুব প্রাচীনকালের বনমানুষদের ফসিল পাওয়া গিয়েছে; কিন্তু তাদের শরীরে আধুনিক বনমানুষদের এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় পাওয়া যায় না—তাদের হাতজোড়া আধুনিক বনমানুষদের মত পায়ের তুলনায় অমন লম্বা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় আর একরকম প্রাচীনকালের বনমানুষের ফসিল পাওয়া গিয়েছে; তাদের বৈজ্ঞানিক নাম অস্টারো পিথেকাস্। এই দু'রকম ফসিলের মধ্যে মিল আছে—কেন না, এদের শরীরেও আধুনিক বনমানুষদের ওই লক্ষণ নেই—এদের হাতজোড়াও অমন লম্বা হয় নি। অথচ আধুনিক বনমানুষদের সঙ্গে এই অস্টারো পিথেকাস্‌দের অন্যান্য সাদৃশ্য আছে: মানুষের তুলনায় এদেরও মস্তিষ্ক আকারে ছোট, গড়নে নিকৃষ্ট, আধুনিক বনমানুষদের মতোই এদেরও চোয়াল অনেক বড় আর ভারি ধরনের। অথচ, মানুষের সঙ্গেও সাদৃশ্যের আভাস পাওয়া যায়; কেন না, এদের দেহেও পায়ের তুলনায় হাতগুলো অমন বেশি লম্বা নয়, শিরদাঁড়াটাও অনেক ঋজু হয়ে এসেছে। তার মানে, এরা ইতিমধ্যেই গাছের বাসা ছেড়ে সমতল জমির উপর নেমে এসেছিলো, আর তাই এদের শরীরেও দেখা দিয়েছিল আধুনিক পরিবর্তনগুলির পূর্বাভাস। কেনিয়ায় আবিষ্কৃত ফসিলগুলির মধ্যে নেই; অতএব এগুলি পরের যুগের। কিন্তু কেনিয়ার ফসিলগুলির মতোই এই অস্কারো পিথেকাসদের দেহগড়নেও আধুনিক বনমানুষদের বৈশিষ্ট্যটি—অর্থাৎ, পায়ের তুলনায় হাতগুলো ঢের লম্বা লম্বা—তারও অভাব। অতএব, আধুনিক বনমানুষদের এ বৈশিষ্ট্যও পরের যুগের, গাছের বাসা ছেড়ে আসতে না-পারার ফলে হাতজোড়া ক্রমশ আরো লম্বা-লম্বা হয়ে চলেছে। কিন্তু আধুনিক বনমানুষদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যারা গাছের বাসা ছেড়ে আসতে পেরেছিল তাদের শরীরে বরং অন্য রকম পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করেছিল—তারা বদলাতে শুরু করেছিল মানুষের দিকেই।

আরো একরকম ফসিলের কথা দেখা যাক। তাদের নাম দেওয়া হয় পিথিকান্ থ্রোপাস্। বিশেষত পিকিং-এর কাছে তাদের যে-সব-ফসিল পাওয়া গিয়েছে সেগুলি বড় আশ্চর্য। আধুনিক মানুষদের তুলনায় মস্তিষ্ক অবশ্যই ছোট আর নিকৃষ্ট, কিন্তু শরীরের গড়নটা মানুষের মতই হয়ে আসছে। এরা গুহায় থাকতো, এমনকি পাথরকে হাতিয়ার করে নিতে শুরু করেছিল। গাছের জীবন ছেড়ে সমতল জমিতে জীবন-ধারণ করতে শুরু করার দরুনই এই সব পরিবর্তন। যারা গাছের জীবন ছেড়ে আসতে পারেনি, তাদের শরীরেও যুগের পর যুগ ধরে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। কিন্তু তা অন্য দিকে, অন্য রকমের—সে-সব পরিবর্তনেরই সঞ্চিত পরিণাম আধুনিক বনমানুষদের মধ্যে।

তাহলে আধুনিক বনমানুষদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝবার জন্যে প্রধানত মনে রাখা দরকার যে, তাদের পূর্বপুরুষেরা গাছের বাসা ছেড়ে আসতে পারে নি। তেমনি, আধুনিক মানুষদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝবার জন্যেও প্রধানত মনে রাখা দরকার যে তাদের পূর্বপুরুষেরা গাছের জীবন ছেড়ে সমতল জমিতে নেমে এসেছিল। আদিম বনমানুষদেরই দুরকম বংশধর—যারা গাছের বাসায় রইলো তাঁদের শরীরে একরকমের পরিবর্তন, যারা নেমে এলো সমতল জমিতে তাদের শরীরে আর একরকম। এই দুরকম পরিবর্তনের ফলেই আজ মানুষে-বনমানুষে এতো তফাৎ—তাই গাছের বাসা থেকে মাটিতে নেমে আসাটাই প্রাণীজগতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় যুগান্তকারী উন্নতির সূচনা করেছিলো। অবশ্যই, বহু কোটি বছর আগেই স্তন্যপায়ী মাংসাশী জানোয়ার আর ক্ষুরযুক্ত জানোয়ারদের পূর্বপুরুষেরাও সমতল জমির উপরেই নেমে এসেছিলো; কিন্তু তখনো তারা ক্রমবিকাশের নেহাতই নিচু পর্যায়ে। তাই তাদের ওই নেমে আসার ফলে জীবজগতের ইতিহাসে এমনকিছু যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেনি। অপরপক্ষে, মানুষের পূর্বপুরুষ ওই আদিম বনমানুষেরা যখন সমতল জমিতে নেমে এসেছে তখন তারা ক্রমবিকাশের অনেক উঁচু পর্য্যায়েঃ সমসাময়িক অন্যান্য জানোয়ারদের তুলনায় তাদের মস্তিষ্ক অনেক উন্নত আর বনমানুষ হিসেবে গাছে গাছে থাকতে থাকতেই এদের সামনের পা-জোড়া আর পিছনের পা-জোড়ার মধ্যে অনেক তফাৎ দেখা দিয়েছে—অর্থাৎ সামনের পা-জোড়া বদলাতে বদলাতে একজোড়া হাতে পরিণত হবার পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে। তাই এদের পক্ষে—ক্রমবিকাশের অতখানি উন্নত পর্যায়ে—সমতল জমিতে নেমে আসার তাৎপর্য অনেক বেশি বৈপ্লবিক।

ক্রমশঃ

জীব ও জীবাণু

সন্তোষ কুমার দাস

মিচুরিন বলেছেন—মানুষ ইচ্ছামত যে কোনও উদ্ভিদ বা প্রাণীতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। টি, ডি, লাইসেঙ্কো মন্তব্য করেছেন যে, জন্মগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন নির্ভর করে জন্মের পর জীবকোষের পরিণাম ক্রিয়ার উপর। আই, ভি, সায়ানও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন,—বলেছেন জীবের স্বভাব ও জন্মগত বৈশিষ্ট্য খাদ্য ও পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়।

জীব বা জীবাণু উভয়েরই দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনশীল। অসহায় জীব যখন নির্বিবাদে আত্ম-সমর্পন ক'রেছিল জীবাণুর কাছে তখনকার অবস্থা আর আধুনিক কালের অবস্থা এক নয়। আজ প্রায় সবরকম ব্যাধির বিরুদ্ধে মানুষের সক্ষম অভিযান সুবিদিত। মানব দেহে ও মনে যে পরিবর্তন এসেছে সে সত্য আজ নতুন করে উপলব্ধি করবার প্রয়োজন নেই—তেমনই জীবাণু জগতেও কী পরিবর্তন আসেনি? বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জীবাণুঘটিত ব্যাধির প্রতিকার আজ সম্ভব। আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি জীবজগতে যেমন স্পষ্ট জীবাণু জগতেও ঠিক তেমনই। রাসায়নিক দ্রব্যের বিরুদ্ধে (Drug resistance) আত্মরক্ষার জন্য কী ধরণের প্রতিক্রিয়া জীবাণুজগতে ঘটে, তার সঠিক সমাচার গবেষণা সাপেক্ষ; তবে এসম্বন্ধে আলোচনা আজকের দিনে অত্যাবশ্যক বলে মনে করি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের শেষভাগে বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি বিভাগে যে সফলতা দেখা গেছে তা অভূতপূর্ব। হাজার হাজার বৎসরের সাধনায় এত সফলতা আর আগে দেখা যায়নি। আজ পৃথিবীর মানবগোষ্ঠিকে একই পর্য্যায়ভুক্ত বলে ধরা যেতে পারে। বিমান বিজ্ঞানীরা 'দূরকে করেছেন নিকট বন্ধু'। বেতার বিজ্ঞানীরা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানের বিজয় বাণী। আজ আর কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য জানতে হলে কালগোণার প্রয়োজন নেই। নব নব গবেষণার ফল মুহূর্তে প্রচারিত হচ্ছে দিকে দিকে। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা আজ এক সমাজভুক্ত—একযোগে কাজ করার সুযোগ এসেছে। পদার্থবিদ্ হাত মেলাচ্ছে রাসায়নিকের সঙ্গে—রাসায়নিক তার গবেষণালব্ধ ফল পৌঁছে দিচ্ছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর হাতে। কয়েক বৎসর আগেও শরীরের অভ্যন্তরে অস্ত্রোপচার একটা ভয়াবহ ব্যাপার ছিল, কিন্তু আজ রাসায়নিক নিয়ে এসেছে নতুন চেতনাহারী ঔষধ, যার প্রয়োগফলে হৃদযন্ত্রের উপরও অস্ত্রোপচার সম্ভব হয়েছে—পদার্থবিজ্ঞানী এনে দিয়েছে কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র, কৃত্রিম মূত্রাশয়, কৃত্রিম রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থা, কল্পনাতীত অস্ত্রোপচার যার দ্বারা সম্ভব হয়েছে। জীবদেহের তাপ কমিয়ে শৈত্যপ্রবাহের মধ্যে নিয়ে শল্য চিকিৎসক চালিয়ে যাচ্ছে তার মৃত্যুজয়ী অভিযান। মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখবার নানা পথ আবিষ্কৃত হ'য়েছে। আজকের মানুষ জীবাণুকে ভয় করে না—তার মনোবল বেড়েছে, মনের পরিবর্তন এসেছে, এসেছে পরিবর্তন মানব দেহে;—তেমনই ক'রে জীবাণু জগতেও কী আলোড়ন না এসে পারে?

বৈদেশিক নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় নিবার্য ব্যাধিতে মৃত্যুর হার ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৮র মধ্যে হ্রাস পেয়েছে শতকরা ৯৩ ভাগ। আমাদের দেশে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই, তবুও আমরা বুঝি যে ম্যালেরিয়া প্রায় উধাও হ'য়েছে, যৌনব্যাধি বিস্ময়করভাবে হ্রাস পেয়েছে। নিমোনিয়া আত্মগোপন করেছে, কালাজ্বর আর কালান্তক ত' নেই-ই, প্রায় অবলুপ্ত হতে চলেছে। কী ক'রে এটা সম্ভব হ'ল? এর জবাব দেবে কী শুধুই আধুনিক

সফল চিকিৎসা বিজ্ঞান ? আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি যদি এ দাবী নিয়ে দাঁড়ায় ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে ক্ষতি নেই। চিকিৎসাবিজ্ঞানে যুগান্তর সুবিদিত—কিন্তু যেন মনে হয় আরও কিছু আছে, শুধুমাত্র জীবাণু ধ্বংসের উপায় নির্ধারণের ফলে এতটা কী সম্ভব ? ম্যালেরিয়া-বিজ্ঞানীর কল্যাণে বাংলার সর্বপ্রধান শত্রু আজ বিধ্বস্ত। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধকারীর দল মশককে প্রাধান্য দিয়েছে তাই মশক ধ্বংশের উপর জোর পড়েছে। কিন্তু মশকের আক্রমণ থেকে সত্যিই কী মুক্ত হয়েছি আমরা ? সরকারী বারবণিতা উচ্ছেদ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে ; সুতরাং এ-কারণে যৌনব্যাধির প্রকোপ হ্রাস পাওয়ার কথা নয়। নিমোনিয়া সংক্রামক ব্যাধি নয়, এর প্রকোপ হ্রাস পাওয়া কী চিন্তার বিষয় নয় ? এমন কী হতে পারে না যে, পরিবেশের প্রভাবে জীবের বা জীবাণুর জীবনে এমন একটা পরিবর্তন এসেছে যার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে ? হুপিং কাশী ও হাম রোগে আগে বহু লোকের প্রাণান্ত ঘটেছে—আজও ভাইরাসের (Virus) কোনও ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। এদের সংক্রমণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে বলেও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু এখন এর থেকে মৃত্যুর হার আশাতীতভাবে কমে গেছে, অবশ্য বর্ণালী জীবাণুধ্বংসী (Tetracycline groups of Antibiotics) ওষুধের প্রভাবে। আনুষঙ্গিক জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এর জন্য আংশিকরূপে দায়ী বললে, উত্তর সম্পূর্ণ হয় না। এমন কী হতে পারে যে, মানুষের দেহে পরিবেশগত এমন কোনও পার্থক্য এসেছে যা'র জন্যে এই রোগে মৃত্যুসংখ্যা কমে গেছে ?

একটি উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যটা স্পষ্ট করে নিতে চাই। 'স্কারলেট্ ফিভার' নামক ব্যাধির জনক স্ট্রেপ্টোককাস্ জীবাণু। ষোড়শ শতাব্দীতে ইন্গ্রেসিয়া প্রথম এর ব্যাখ্যা করেন। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে সীডেনহাম্ এর নাম দেন 'স্কারলেটিনা'। সে সময় এ রোগে, বেশ সুন্দর টুকটুকে লাল লাল ছোপ ধরত সারা গায়ে, আর কোনও উপসর্গ থাকত না। কিছুদিন পরে সেটা আবার মিলিয়ে যেত। এ রোগে মৃত্যু দেখা যেত না। আঠার ও উনিশ শতাব্দীতে এই রোগই আবার মহামারীর রূপ ধারণ করল। বহুলোক মারা গেল—কেন ? অবশ্য জীবাণু জগতে মধ্যে মধ্যে আকস্মিকভাবে (?) নানা পরিবর্তন দেখা যায়,—তবে সেটা খুব কম এবং তাতে তার স্বভাবের পরিবর্তন খুব কম ঘটে।

আষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে মার্লবরোর যুদ্ধ ঘটে। অবশ্য সারা য়ুরোপকে নাড়া দেবার মত উল্লেখযোগ্য ঘটনা এ নয় যাতে করে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটবে। জীবাণু জগতের কোনও পরিবর্তনই এর জন্য দায়ী একথা বলা কী ভুল হ'ল ? উনিশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবার কম হয়ে এল এর সংহার শক্তি, কিন্তু ১৮৩০ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত আবার মহামারীর রূপ দেখা দিল। আবার কম হল ১৯৩১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত। মৃত্যুহার প্রতি দশ লক্ষে ৭২০ থেকে নেমে দাঁড়াল মাত্র ১১তে। আজ আর এই ব্যাধিকে কেউ ভয় করে না। আজকের দিনে ওষুধের দ্বারা একে জয় করা যায়। জীবাণুর সংক্রমণ-প্রবণতা একই রকম থাকা সত্বেও এ ব্যাধির প্রকোপ কমে গেছে। ইন্ফ্লুয়েঞ্জার কথা আশা করি সকলের স্মরণ আছে। যে ইন্ফ্লুয়েঞ্জা য়ুরোপকে নাড়া দিয়েছিল, কয়েকবার মহামারীর বান ডেকে এনেছিল, এদেশে সেটা কেবলমাত্র "ফ্লু" ছিল। কিন্তু ১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে এই দেশেই সেটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পঙ্গু করে দিয়েছিল। আজ আবার এই 'ইনফ্লুয়েঞ্জাই' 'কিছু নয় ইন্ফ্লুয়েঞ্জা' হয়ে দাঁড়িয়েছে। যক্ষ্মা রোগের নাম পর্যন্ত আগেকার দিনে আতঙ্কের কারণ ছিল ; আজ তা নেই। যক্ষ্মা জীবাণু ক্রমশঃ ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি আয়ত্ত করে, আমরা জানি। কয়েক বৎসর পূর্বেই এর আক্রমণ চিকিৎসার আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। জীবাণুর

আক্রমণ-ক্ষমতার নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। আর জীবদেহের পক্ষেও কথাটা সত্য। গিনিপিগের দেহে জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে যক্ষ্মার উৎপত্তি এখন আর সহজসাধ্য নয়। মানব শরীরেও গলিত ও কাঠিন্যপ্রাপ্ত (Exudative Pneumonic) ব্যাধির প্রকাশ, অনুপরিব্যাপ্ত (Miliary) এবং মস্তিষ্কঝিল্লির যক্ষ্মা (Meningeal) এখন কম দেখা যায়। জীব ও জীবাণুর জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছাড়া এটা সম্ভব হ'ত না।

লক্ষ লক্ষ বৎসরের একত্র বসবাসের ফলে জীবাণুর সঙ্গে সহযোগিতার সম্বন্ধ গড়ে না ওঠার কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কী? মানবদেহে জীবাণুর সহযোগিতার প্রক্রিয়া না থাকলে জীবন ধারণ সম্ভব হ'ত না। বহুপ্রকারের জীবাণু শুধু যে বন্ধুভাবে জীবদেহে আশ্রয় নেয় তা নয়, মানুষের খাদ্য পচনে ও জীবন ধারণে সহায়তা করে। পরিবেশের পরিবর্তনে পরাক্রান্ত হয়ে এরাই যে আবার উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করতে পারে, এর প্রমাণও আছে। উত্তর আমেরিকার উপ-বসবাসের সুরুতে ১৭ ও ১৮ শত খৃষ্টাব্দে বহু মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ফিজি দ্বীপে ২০ থেকে ৪০ হাজার লোক মহামারীর কবলে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বহু বৎসরের বসবাসের ফলে জীব ও জীবাণু নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, তাই মহামারী কমে গেছে,—একথা বলা কী ভুল হবে? বিজ্ঞানে অগ্রগামী দেশ সমূহ জয় করেছে অনেক ব্যাধিকে। ইংলণ্ডে ডিপথিরিয়া বিদূরিত হয়েছে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড এখন কেতাবি বিদ্যায় রূপান্তরিত হয়েছে; রুশ সরকার নাকি যক্ষ্মা হাসপাতাল তুলে দিয়ে অন্য কাজে লাগাবার চিন্তা করছে। যক্ষ্মা জীবাণুর সংক্রমণ বিদূরিত না হলেও, এই জীবাণু শরীরে বহন করে বেড়াচ্ছেন বহুলোক। বারমিংহাম সহরে বি, সি, জি টিকা ব্যাপকভাবে দেবার সময় স্প্রিংগেট দেখিয়েছেন, ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ এর মধ্যে ১৩ বৎসর বয়স্ক ছেলেদের সক্রমণতা ১৮·৩ থেকে ১১·৯এ নেমে গেছে। এ্যামেরিকায় সর্বব্যাপক বি,সি,জি টিকা দেওয়ার ফলে যক্ষ্মা কমে গেছে। বি,সি,জি টিকাতে জীবন্ত যক্ষ্মা জীবাণু থাকে, যেটার রোগউৎপাদন ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে বৎসরের পর বৎসর কৃত্রিম উৎপাদনের ফলে। তেমনই করে জীবদেহে স্বাভাবিক উৎপাদনের ফলে ঐ পরিস্থিতির উদ্ভব কি একেবারে অসম্ভব?

নিবার্য-ব্যাধির টিকা নিয়ে, ব্যাপক জীবাণু বিনাশের ব্যবস্থা করে কোনও দিন যে মানুষ জীবাণুর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটাতে পারবে এ আশা বিরল। আবার তাও যদি হয়, তবে জীবের সহায়ক জীবাণুদের কী ব্যবস্থা হবে? দ্রুতপরিব্যাপক ব্যাধিগোষ্ঠীর প্রতিরোধ নানাভাবে, অন্ততঃ আংশিক ভাবে সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু সব ব্যাধির ব্যাপক প্রতিরোধ ঠিক সেই ভাবে সম্ভব নয়। এ ছাড়া দেখা গেছে জীবাণু বহনকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংশী ওষুধগুলো কিছুদিন পরে অকেজো হয়ে যায়। কীটপতঙ্গেরা ঐ গুলোর সঙ্গে যেন ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলে। জীবদেহের বর্তমান বিকাশের মূলে আছে লক্ষ লক্ষ বৎসরের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, অসহ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার প্রচেষ্টা। এই সংগ্রামের ফলে একদিনের বহু শত্রু-জীবাণু আজ মিত্র-জীবাণুতে পরিণত হয়েছে। জীবের ও জীবাণুর দ্বন্দ্ব উভয়েরই আত্মরক্ষাত্মক ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে ও ঘটাবে। জীব ও জীবাণুর আঙ্গিক ও শারীরবৃত্তমূলক পরিবর্তন তাদের পরিবেশ ও পরিণাম ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। জৈব-রসায়ণ ও কুলসংক্রমণ তত্ত্বের আধুনিক তথ্য-প্রয়োগে জীব ও জীবাণুতে পরিকল্পিত পরিবর্তন ঘটিয়ে দ্রুত ও সম্পূর্ণভাবে জীবাণুঘটিত ব্যধির নিরসন সম্ভব হবে অদূর ভবিষ্যতে।

পুস্তক-পরিচয়

"সাইকলজি ইন্ দি সোভিয়েত ইউনিয়ন" অরুণা হালদার

(ক) ব্রায়ান সাইমন সম্পাদিত 'Psychology in The Soviet Union' বইটি রুটলেজ এণ্ড কেগান পল কর্তৃক প্রকাশিত এবং International Library of Sociology And Social Reconstruction কর্তৃক প্রচারিত। বইটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ডে কয়েকটি করে সুলিখিত নিবন্ধ। সর্বপ্রথম সম্পাদকের লেখা মূল্যবান ভূমিকায় সোভিয়েত দেশের মনোবিদ্যার আলোচনার গতি ও প্রগতির একটি মূল্যবান পরিচয়। প্রতিটি খণ্ডেই এক-একটি বিশেষ বিষয়ের উপর উপর লেখা নিবন্ধগুলির নির্বাচন ও সাজানোর প্রণালীও সুন্দর। নিবন্ধগুলির পূর্বাপর বিন্যাসের মধ্য দিয়া তথ্যগুলিরও একটি ক্রমিক বিকাশের ধারা পাওয়া যায়। প্রথম খণ্ডে আছে সোভিয়েট-ভূমিতে মনোবিদ্যা বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। দ্বিতীয় পর্বে মোটামুটি General Psychologyর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি ; যেমন শিশুজীবনের বিকাস, Attention (অবধান), প্রত্যক্ষ অববোধ (বুদ্ধি), চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বৈশ্লেষিকী ক্রিয়ারূপ, ভাষা ও সংকেত-সম্বন্ধ এবং ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিকাস প্রবন্ধগুলি আছে। তৃতীয় পর্বে 'স্থান প্রত্যক্ষ,' স্মৃতি ও অনুষঙ্গ, প্রবন্ধগুলি দেওয়া আছে। চতুর্থ পর্বে শিশু মনোবিদ্যার এবং শিশু শিক্ষণ পদ্ধতির সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োগাত্মক (Practical) প্রবন্ধ আছে। শিশুর 'মনের গঠন' ও 'মনের বিকাস' আলোচিত হয়েছে শেষের দুটি প্রবন্ধে। পঞ্চম পর্বে মনোবিদ্যার পদ্ধতি সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ এবং অন্যটি অভ্যাস ও নিপুণতা সম্পর্কে একটি গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ। এ ছাড়া Appendix I এ U. S. S. R.এ Psychopathologyর উপর গবেষণা এবং Appendix IIতে চতুর্দশ International Congress of Phychologyর উপর আলোচনা আছে। পরিশেষে একটি উৎকৃষ্ট Bibliography ও Index এই পুস্তককে সুসম্পূর্ণ করেছে।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, বইখানির একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। এতাবৎ কাল আমরা এক বিশেষ ধরনের মনোবিদ্যার চর্চাই করে আসছি ; সে বিদ্যা আমাদের কাছে পরিবেশিত হয়েছে ইয়োরোপের সোভিয়েত ব্যতিরিক্ত দেশসমূহ এবং আমেরিকার মনোবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা-সাহিত্যের মাধ্যমে। এখনও সমগ্র ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের একাধিপত্য লক্ষ্য করার মত। ইংলণ্ডে হ্যাভলক এলিসের নাম কেবল একমাত্র Sex Psychologyর মধ্যেই নির্দিষ্ট হয়ে থেকেছে। অপর দিকে আমেরিকায় Existential Psychology এবং বাহ্য নিরীক্ষণের পন্থায় তথ্য নির্ণয়কারী ব্যবহারাত্মক মনোবিদ্যার প্রসার ঘটে। বলা বাহুল্য, উপরিউক্ত দুটি শাখাই ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যার থেকে পৃথক ; তা সত্বেও সেই পার্থক্যের মধ্যে একটা যোগসূত্রও বিদ্যমান। তার কারণ, প্রত্যেকটি শাখার কোনটাই যথেষ্টভাবে বা যথোপযুক্তরূপে বাস্তববাদী পন্থায় মনোবিদ্যার চর্চা করে না। জার্মাণ দেশের মনোবিদ্যা পদ্ধতির একতম Gestallism সম্পর্কেও ঐকথা বলা যায়। একদিক থেকে জার্মাণ দেশেই প্রথম মনোবিদ্যা শাস্ত্রের আরম্ভ। কিন্তু সেই প্রারম্ভিক মনোবিদ্যার চর্চায় বিস্ময়কর তথ্যাদি পাওয়া গেলেও, যথাশাস্ত্র

Physics or Chemistry'র মত সমাদরে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তবুও এই হ'ল মোটামুটি মনোবিদ্যাশাস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনার ঐতিহাসিক পরম্পরা। আর মনোবিদ্যার শুরুই হয়েছে মাত্র উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে।

প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ যোগ্য যে, ফ্রয়েডের ন্যূনাধিক সমকালেই পাভলভের আবির্ভাব। কিন্তু, ইতিহাসের সূত্র ধরে একথা লক্ষ্য করা যায় যে, বর্তমান শতকের প্রথম থেকে রুশদেশে রাষ্ট্রশক্তি স্থিরভাবে ছিল না এবং ১৯১৭ এর বিপ্লবের বলে রাষ্ট্রশক্তি স্থিররূপ পাবার পরে, নানারূপ রাজনৈতিক কারণে দীর্ঘকাল সে দেশের সঙ্গে অপরাপর দেশের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ বা আদান-প্রদানও ছিল না। সম্ভবতঃ সেই কারণেই পাভলভের গবেষণা সংক্রান্ত সাহিত্যের প্রচার বহির্জগতে ঘটেনি। রুশ দেশে প্রাণিবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের মোড় ঘুরে যায়; তার ফলে সেখানকার সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতিও নূতন ধারায় প্রবর্তিত হ'তে থাকে। অনিবার্য্য কারণেই এই বিজ্ঞানভিত্তিক মনোবিদ্যার আলোচনা অগ্রসর হ'য়ে চলে এবং মানব-মঙ্গল নীতিই তার লক্ষ্য হ'য়ে ওঠে। অবশ্য প্রতি দেশে প্রতি বিজ্ঞানীই মানব মঙ্গল নীতির সমর্থক ব'লে নিজেকে মনে করেন। লক্ষ্য সবার এক হ'লেও প্রয়োগিক প্রণালীতে ভিন্নতা থাকে। এবং সেই ভিন্নতার জন্যই পাভলভীয় মনোবিদ্যার এক স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। প্রথমতঃ তার ভূমি প্রধানত হলো বস্তুনিষ্ঠ (Objective) এবং যে দর্শন অনুসারে তা চলে তা হলো বস্তুবাদী দর্শন বা Materialistic Philosophy; দ্বিতীয়তঃ তার সমর্থনযোগ্য পরিবেশ ও অনুকূল ভূমি হ'য়ে ওঠে সোভিয়েতপন্থী রুশ। বলা বাহুল্য সমসাময়িক অন্যান্য দেশের দর্শন ও বিজ্ঞান স্বভাবতই রুশদেশের চিন্তাধারার সঙ্গে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সম্পর্ক অনেক দিনই পায়নি। এদিক দিয়ে এই আলোচ্যপুস্তকের অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা ছিল।

অন্যদিক দিয়ে দেখলে আরো একটি কথা মনে হয়। পূর্বে যে সকল মনস্তত্ত্বের ধারার উল্লেখ করেছি, সেগুলির স্বরূপ পরীক্ষ-নিরীক্ষা ক'রে মনস্তত্ত্বের গবেষক, অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কিছু লোক হয়ত গোঁড়া ব্যবহারাত্মক দিকটাই সমর্থন করেন; বেশ কিছু লোক Gestaitist; ইংরাজ মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যেও একটি স্বতন্ত্র বস্তুনিষ্ঠ মতবাদ বর্তমান। কিন্তু এ সকল সমর্থকের সংখ্যা ছাপিয়ে পৃথিবী জোড়া নাম রয়ে গেছে ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যা শাস্ত্রের—সম্ভবতঃ সেই শাস্ত্রবিদ এবং মনঃসমীক্ষক চিকিৎসকের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী। ফ্রয়েডীয় মতের চিকিৎসাবিদ্‌দের মধ্যেও মতানৈক্য আছে। তাঁদের মধ্যেও কিছু অংশ চিকিৎসাবিদ্ হ'তে গেলে, দেহরোগের বিষয় অর্থাৎ Medical Scienceএ-ও পারদর্শিতা প্রয়োজন একথা মনে করেন। আর অপর দলের যাঁরা, তাঁরা চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিদ্ না হয়েও ফ্রয়েডীয় মতে মনোরোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে, এই কথা বলে থাকেন। সমস্ত ইয়োরোপে এবং আমেরিকাতে এই দুই মতের লোকই আছেন। কিন্তু এই সকল প্রকার মতের সমর্থকদের মধ্যেই ক্রমশঃ দেখা দিয়েছে মনোবিদ্যার স্বভূমিতে তাকে আবিষ্কার করার আগ্রহ; তাঁরা চাইছেন বস্তুনিষ্ঠ প্রণালীতে মনোবিদ্যার চর্চা। অনেকেই রুশ দেশের গবেষণার দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। আমেরিকায় এবং জাপানে বিজ্ঞানীরা, স্নায়বিক আধারে মনোবিদ্যার চর্চা করতে চেয়েছেন কিংবা Learned action ও যে দীর্ঘকাল স্নায়বিক অভ্যাসের ফলে সংস্কারের মত সহজাত হয়ে যায়, তা দেখিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এঁদের থেকে একটি কোনও সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনা-সূত্র বা পদ্ধতি আমাদের হাতে এসে পৌঁছায় নি। বর্তমান আলোচ্য পুস্তকের দ্বারা একদিকে অনেক কালের একটা অভাব মিটল মনোবিদ্‌গণের; আর, তাছাড়াও, সাইমন প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ সাক্ষাৎভাবে, রুশীয় মনোবিদগণের সহায়তা ও আলাপ-আলোচনার প্রত্যক্ষ মাধ্যমে দৃঢ়তর

ভাবেই মনোবিদ্যাকে তার স্বভূমিতে প্রত্যক্ষ করলেন। সম্পাদক এজন্য সর্বপ্রথমেই পুরাতন মনোবিদ্যার শাখাগুলির সঙ্গে এই গ্রন্থের আলোচনাপদ্ধতির ভিন্ন ধরনের ভিত্তিকে পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন। এ জন্য তিনি মনোবিদ্যার ছাত্র মাত্রেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

(খ) ইংরাজীতে একটা কথা আছে—"One cannot deceive all people for all time।" কথাটা একটু বদল করে অর্থ করতে পারা যায়, ভ্রম কখনো চিরস্থায়ী হয় না। স্বাভাবিক নিয়মেই সত্য নিজেকে উন্মোচন করে। মনোবিদ্যার অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও সেরূপ ঘটেছে। ভৌতিক বিদ্যা (Phyiscs) রসায়ণশাস্ত্র (Chemistry) প্রাণিবিজ্ঞান (Biology) প্রভৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি কল্পনা বা Hypothesis করা হয়; পরে সেই Hypothesis থেকে অন্যান্য ঘটনাকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করা হয় (Deduction); এইরূপ পদ্ধতি মনোবিদ্যার ক্ষেত্রেও অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু অপরাপর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘটনা বা Phenomenaগুলি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সত্য (Perceptible facts) বলে সেগুলির ব্যাখ্যা করা বা প্রয়োজন মত বদল করাও অসম্ভব হয় না। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে ঘটনা or Phenomena ঐরূপ অর্থে সত্য বা fact ব'লে বোঝা যায় না—সেখানে কতকটা 'ধারণা' (Idea) করে নিতে হয়। এইরূপ অসুবিধা দীর্ঘকাল ধ'রে মনোবিদ্যার পরীক্ষানিরীক্ষা ও প্রায়োগিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে ঘটে এসেছে; অন্ততঃ এই অসুবিধাকে মেনেও তাকে দূর করার উপায় বাহির হয়নি। পাভলভীয় মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে এই অসুবিধাটিকেই প্রথম দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি। 'মনন' or minding or consciousness যে অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা নয়--ভাবমাত্র নয়—তারও যে বাস্তবিক আধার আছে, এ তথ্যের অনুসরণ ক'রে পাভলভ মনোবিদ্যার অধ্যয়নক্ষেত্রে একটা নূতন সার্থক পরিকল্পনা আনলেন। এটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা নবতম আবিষ্কার, তথা মানবমনের একটা বিশেষ উৎকর্ষ বলে পরিগণিত হ'তে পারে। পাভলভের মতানুসারে নানাবিধ শারীরকার্য্যের মত (organic function) মননকার্য্যও মস্তিষ্কাশ্রিত। তার মাধ্যম বা আধার হ'ল (১) স্নায়ুতন্ত্রীর বিবিধরূপ সরল বা জটিল বিন্যাস (Reflex patterns or organisation) (২) প্রতিস্নায়ুর বিবিধরূপ উত্তেজনা ও নিস্তেজনা। (Excitation and Inhibition) (৩) এই উভয়বিধ প্রক্রিয়ার সমন্বিত রূপ কোনও একটি স্থির রূপ (Fixed pattern) মাত্র গ্রহণ করে না—তা বিশ্বরূপ তথা পারিপার্শ্বিক (Universal environment) এর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রস্তুত করে, পরিকল্পনা করে আগে চলে অথবা পিছু হটে জীবনেরই তাগিদের (৪) আর এই সমস্ত পদ্ধতিটাই (Elan vital) বা অতীন্দ্রিয় প্রাণশক্তির দরুন সক্রিয় হয় না—তার ক্রিয়াগুলি বা আনুষঙ্গিক পরিবর্ত্তনের ধারাগুলি বৈজ্ঞানিক নিয়মে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলায় সম্পর্কিত। (৫) বাস্তবানুগ ভিত্তিতে পাভলভ এই মনোবিদ্যার অধ্যয়নকে একদিকে প্রাণিবিজ্ঞানের সঙ্গে (Biology) সংযুক্ত করেছেন; অপরদিকে করেছেন শারীরবিজ্ঞান (Physiology) এবং সমাজবিজ্ঞান (Sociology and Social Anthropology এর সঙ্গে। Origin of Lifeএর সঙ্গেই জড়িত আছে Origin of Mind এর ইতিহাস ও তার বিকাস, একথা প্রকৃতির সহস্র উদাহরণের মধ্যেই মিলবে। আপেল পড়তে দেখে নিউটনের আবিষ্কারের মতই পাভলভের এই উদ্ভাবনাও গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার নিম্নতম প্রাণের সঙ্গে তার আধার ভৌতিক পরমাণু জড়িয়ে আছে; তেমনিই নিম্নতম প্রাণের বিকাস ঘটছে আর সঙ্গে সঙ্গে তার চেতনাও বিকসিত হচ্ছে; নিম্নতম প্রাণিচেতনার থেকে মানুষের মত উচ্চতর প্রাণিচেতনার ক্ষেত্রেও অলঙ্ঘ্য নিয়মেই সেই যোগসূত্র থেকে যাচ্ছে; জটিলতার আবির্ভাব হচ্ছে তার দেহে তথা তার চেতনায়ও। বিভিন্ন প্রাণিস্তরের মধ্যে মস্তিষ্কেরও বিকাস ঘটছে অর্থাৎ স্নায়ুমণ্ডলীর বিবর্ত্তন বিকাস ঘটছে। তারফলে তৎপ্রাণীর ক্ষেত্রে চেতনার বিভিন্ন উৎসের বিভিন্ন ধারায় পরিণতি ঘটছে। বুদ্ধির উৎকর্ষ, সচেতন দায়িত্বশীল ক্রিয়া, আবিষ্কার

প্রভৃতি উত্তরোত্তর বিকশিত চিন্তার সঙ্গে গুরু মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্তরের উৎপত্তিলয়ের অনিবার্য সম্বন্ধ পাভলভ স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে ও সামান্যরূপে শারীরতত্ত্বাশ্রিত মনোবিদ্যা (physiological) সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছি।

আজকের দিনে রুশদেশে মনোবিদ্যার প্রভূত অগ্রগতি ঘটেছে ও ঘটছে। পাভলভের সূত্রকে সে দেশের মনোবৈজ্ঞানিকগণ আরো এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। শর্তাধীন পরাবর্ত্ত (Conditioned Reflex) সূত্রের দ্বারা মনোবিদ্‌গণ ঘটনার সার্থক ব্যাখ্যা করেছেন। মনোবিদ্যার প্রায়োগিক ক্ষেত্র ও অনুশীলন ক্ষেত্র অর্থাৎ Practical এবং Theoretical উভয়দিকেই তাঁদের অপ্রতিহত গতি। অবশ্যই এই দুটি দিক কখনই পরস্পরের থেকে বিযুক্ত হ'তে পারে না। আর, তার চেয়েও বড় কথা মানুষের জীবন ও ভবিষ্যৎকে স্বচ্ছন্দ করার জন্য মনস্তত্ত্বের প্রায়োগিক আয়োজন বিস্তৃত হয়ে এসেছে। আশা করা যায় মানুষের প্রয়োজন তার পরিধি আরো ব্যাপক হবে ক্রমশই। মহাশূন্যের অভিযানে ব্রতী মানুষের মনস্তত্ত্ব একটি পরম বিস্ময়কর আলোচনার বিষয়বস্তু। নিঃসঙ্গ-ভাবে থাকতেও মানুষ অভ্যস্ত হ'তে পারে,—মহাশূন্যের যাত্রীর পক্ষে নিঃসঙ্গতা অবশ্যম্ভাবী শাস্তি না হয়ে প্রয়োজন বা দায়িত্বের সঙ্গে পরিতোষও যোগাতে পারে, সেকথা নিশ্চয় অভিযাত্রী গাগারিণ বা টিটফের ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে। বলা বাহুল্য, এই রকম নানা নতুন নতুন দিকে মনোবিজ্ঞানের গবেষণা চলেছে এবং আমাদের চোখের সামনে আজ মনস্তত্ত্বের দূরপ্রসারী দিগন্ত।

মানুষকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা যায় না—দেখলে তা একদেশ দর্শন হয় মানুষ অবিচ্ছিন্নভাবে তার বাতাবরণ বা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে জড়িত। পরিবর্তন দুজনাতেই হচ্ছে। আবার দুজনার পরিবর্তনের ফলে দুজনাই নূতন করে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। মানুষ সক্রিয় চেষ্টায় নিজেকে ও বাতাবরণকেও নূতনরূপে পরিবর্তিত করতে সক্ষম, চৈতন্য সাহায্যে চেতনার এই উপকরণ যোগাচ্ছে গুরুমস্তিষ্ক। এই স্নায়ুতন্ত্র উদ্‌ঘাটনের পথ ধরে রুশদেশে মস্তিষ্কের, বিশেষ গুরুমস্তিষ্কের আকার-প্রকার ও অভিব্যক্তি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। Soviet Psychiatry, Soviet Psychological medicine Soviet Psychology Defectology, Education, Child Psychology ও তাঁর Developmental study এবং সর্বোপরি General Psychologyর বস্তুবাদ সঙ্গত বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষায়তন ও তার প্রয়োগের সর্বাধুনিক ব্যবস্থা এই হলো বর্তমানের রুশ দেশের মনস্তত্ত্বের প্রধানতম শাখাগুলি। আলোচ্য গ্রন্থে মোটামুটি এইসবের একটি সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাওয়া যাবে।

ভবিষ্যতের আর একটি ইঙ্গিত এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। সেই কথা ব'লে বর্তমান নিবন্ধ শেষ করব। ইংরাজীতে দুই একটা কথা আছে, যেমন 'Character is fate' অথবা 'man makes himself', এই কথাগুলির এক দিকের বৈচিত্র্যহীন স্থির অবস্থার একটা নির্দেশ পাওয়া যাবে 'Unconscious Determination of Personality' তথ্যটার মধ্যে 'চরিত্রের সেই অন্তর্গূঢ় নির্দেশে তৈরী হচ্ছে এক একটা বিশেষ ছকের মানুষ'—এমনতরভাবেই আমরা ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছি। তার ফলে যেন নিরাশা ও নিয়তি আমাদের চারদিকে ক্ষয়রোগের মত ঘিরে আছে। বলা বাহুল্য এটা সুস্থ অবস্থা নয়। বস্তুবাদী মনস্তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে হয়ত এখনও ত্রুটি আছে, হয়ত অসহিষ্ণু আতিশয্যও আছে, তবুও একথা দ্বিধাহীনভাবেই মানতে হয় যে, বস্তুবাদী মনস্তত্ত্ব উন্নততর শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিসত্তা গঠনের দায়িত্ব নিয়েছে, ভাগ্যের ও Unconcious determination এর হাত থেকে নিস্তার দিয়েছে।

নূতন যুগের নূতন মানুষের গঠন ছকে কাটা নয়। তার গঠনের প্রকৃতির মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে সেই পরিবর্তনের একটা বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ শৃঙ্খলা আছে। মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতর সমুজ্জ্বল মহিমার ধর্মও অনাবিষ্কৃত অবান্তর কল্পনা নয় তার কাছে। ভবিষ্যতের এই স্বপ্নকে সত্যরূপ দেওয়াই বিজ্ঞানের সাধনা। আর সেই সাধনার পথে বর্তমানে রুশদেশ কতটা অগ্রসর হয়েছে তারই একটা চিত্র আলোচ্য গ্রন্থে মিলবে।

"The dialectical method involves, therefore, a view of the world, not as a complex of 'ready-made things', each with its own fixed properties, but as a complex of processes in which all things arise, have their existence and pass away ; it insists that all phenomena must be studied, in their movement and change and in inseparable connection with other phenomena. It does not therefore separate matter from motion, from space and time, but regards matter in motion as fundamental and inseparable from space and time. ... ... The relevance of this conception to problems of relation of body and mind, of the transition from sensation to thought, for instance, and to detailed questions concerning the relation of practical activity and mental processes is obvious"

[Introduction to Psychology in the Soviet Union pp 5]

সম্পাদকীয়

জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গীসম্পৃক্ত। এককোষ প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের পরিণতি মানবদেহ। মানবমস্তিষ্কের জটিল ক্রিয়াকলাপের সম্যক অনুধাবন ইতর প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও বৃত্তির অনুশীলন সাপেক্ষ। মানব-মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তি ও মানবপ্রকৃতির কারণ ও স্বরূপ নির্ণয়ে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুবিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য, কেন না সর্বপ্রকার মানসিক ক্রিয়াই মস্তিষ্কাশ্রিত। আবার প্রাণীমস্তিষ্ক ও মানবমস্তিষ্কের সাংগঠনিকও বৃত্তিক বিভিন্নতার সবিশেষ ও সম্পূর্ণ জ্ঞান ব্যতিরেকে মানবমনের বিচিত্র ও বিবিধ প্রতিক্রিয়া বুদ্ধিগম্য হতে পারে না। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ মানুষ বিশ্বপ্রকৃতিতে স্বকীয় শ্রমবিনিযোগে পরিবর্তন-প্রয়াসী ও সত্যই পরিবর্তনক্ষম। যূথবদ্ধ পশু ও সমাজবদ্ধ মানুষের গুণগত বিভিন্নতা অনস্বীকার্য। লক্ষ লক্ষ বৎসরের শ্রমের ফলে মানবদেহে ও মস্তিষ্কে বহুবিধ পরিবর্তন সংসাধিত হয়েছে। এই সব পরিবর্তন মানুষকে,—এমনকি বর্ব্বর যুগের মানুষকে ও, পশুদের অলভ্য অনেক গুণের অধিকারী করেছে। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার প্রেরণা ও প্রয়োজন থেকে ভাষার উৎপত্তি। ভাষা থেকে ভাষাভিত্তিক চিন্তার উন্মেষ। ফলে পশুজগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত মানবজাতি।

মানব সমাজের ক্রমপরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটছে। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানবপ্রকৃতির ও মানসিকতার ও পরিবর্তন অনিবার্য। সমাজবিজ্ঞানের চর্চ্চাও তাই মনোবিজ্ঞানীদের কাছে অপরিহার্য!

আমাদের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞান বিতরণ বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ পরিবেশন নয়। মানুষে মানুষে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, জাতিতে জাতিতে যে মানসিকতার পার্থক্য ও দ্বন্দ্বের সূত্র প্রতীয়মান তার মৌলিক কারণ নির্ণয় ও সেই পার্থক্য ও দ্বন্দ্বের বিজ্ঞনিভিত্তিক নিরসন-প্রয়াস আমাদের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আমাদের আকাঙ্ক্ষা হয়ত আমাদের সামান্য শক্তি ও সামর্থ্য-আনুপাতিক নয়; কিন্তু আমরা শক্তি সামর্থ্যের ক্রমোন্নয়নে বিশ্বাসী। প্রাকৃত-বিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ যেমন প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করে মানবজাতির কল্যাণ সাধনে সক্ষম, তেমনি মনোবিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ সূত্রগুলির প্রয়োগে মানসিকতা ও মানবিক সম্পর্কের উৎকর্ষ সাধন সম্ভব।

* * * *

জৈবরসায়নের নব নব আবিষ্কার আজ প্রাণের প্রথম উন্মেষ রহস্যের সমাধান-সূত্রের সন্ধান দিয়েছে। "Life originated on earth at a certain necessary stage in the general historical development of matter"; বিশেষ পরিবেশে সুদূর অতীতে প্রাণের সাড়া জেগেছিল বস্তুর বুকে।...সে সাড়া বস্তুরই ঐতিহাসিক ক্রমোন্নয়নের ফল। নিজস্ব নির্দিষ্ট নিয়মে পার্থিব প্রাণ বিশেষ পরিণামক্রিয়ার (metabolism) অধীন। এই পরিণামক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে পরিবেশের পরিবৃত্তিতে। ফল—জীবদেহের সাংগঠনিক বিন্যাস ও জৈবক্রিয়ার ক্রম পরিবর্তন; নতুনগুণসমন্বিত নতুন প্রজাতির সৃষ্টি। ক্রমবিবর্তনের শেষ ধাপে-হোমো-স্যাপিয়েনসের আবির্ভাব। দেহের বৈশিষ্ট্য ও জটিলতার সঙ্গে নার্ভতন্ত্রের ও বৈশিষ্ট্য এবং জটিলতা অর্জন করল হোমো স্যাপিয়েন্স।

* * * *

প্রথম প্রাণের উন্মেষ থেকে মানব-চৈতন্য বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস আজও হয়ত স্পষ্টতার দিক থেকে সুসম্পূর্ণ নয়, হয়ত এখনও কিছু কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিচ্ছেদকন্দর নতুন আলোকপাতের অপেক্ষা রাখে; কিন্তু

রহস্যবাদ বা অধ্যাত্মবাদের অবকাশ আজ নেই। প্রাণের বা চৈতন্যের উন্মেষ ব্যাখ্যায় অপার্থিব, অবাস্তব, অতীন্দ্রিয়, কোনো শক্তির কল্পনা আজ বিজ্ঞানীর কাছে শুধু নিরর্থক নয়, হাস্যকর। জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানের আধুনিক ধারা শুধু কয়েকজন বিজ্ঞানানুরাগীর কাছে নয়, জনসাধারণের কাছে সুব্যক্ত হওয়া দরকার। অদৃশ্য অজ্ঞেয় কোনো শক্তি (elan vital) বা নির্জ্ঞান মনের অদম্য প্রবৃত্তি যে ব্যক্তি-মানস ও সমাজ-মানসের সংগঠক বা নির্দেশক নয়—মানুষের কাছে এ জ্ঞান সবিশেষ মূল্যবান। সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে আন্তর্মানবিক সম্পর্কের সমুন্নয়ন, আজ বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষের প্রয়াসসাধ্য ও এই প্রয়াসে আমাদের সকলেরই ভূমিকা সুনির্দিষ্ট। আর সেই ভূমিকার দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন আমাদের প্রত্যেকের প্রাথমিক কর্তব্য। 'মানব মন' এর প্রকাশন পাভলভ ইনষ্টিটিউটের সভ্যদের নির্দিষ্ট ভূমিকা। এই ভূমিকার দায়িত্ব পালনের প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব কখনও পরিলক্ষিত হবে না, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

* * * *

প্রাকৃতবিজ্ঞানের সূত্রপ্রয়োগে প্রকৃতিকে প্রয়োজনমত পরিবর্তিত করা আজ মানুষের কাছে আর স্বপ্ন নয়। আজ পরমাণু কেন্দ্র থেকে অসীম অন্তরীক্ষ পর্যন্ত সর্বত্র বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অব্যাহত। জীবনবিজ্ঞানেরও বহু নতুন সূত্র আজ আবিষ্কৃত, বহু নতুন তথ্য অধিকৃত। মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানের অধুনালব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগে নতুন উন্নততর মানুষ সৃষ্টি আজ আর অসম্ভব নয়। আলডু হাক্সলী বা জর্জ অরওয়েল মানবজাতির ভবিষ্যতের যে-অন্ধকারময় নিরাশার ছবি এঁকেছেন, মনোবিজ্ঞানীর, জীববিজ্ঞানীর কাছে তা অবাস্তব। পাভলভ-প্রমুখ আধুনিক বস্তুনিষ্ঠ মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানুষ পরিবেশের দাস নয় ; পরিবেশকেও মানুষ প্রভাবিত করে, পরিবর্তিত করে। মানব-সত্তার পক্ষে অকল্যাণকর রিফ্লেক্স, প্রজাতির পক্ষে ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকারক রিফ্লেক্স, দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। প্রতিকূল পরিবেশে ডায়নসরসদের বংশবিলুপ্তির নজির দ্বিতীয় সংকোতিক-স্তর-সমন্বিত, উচ্চ মস্তিষ্ক-বিশিষ্ট মানবজাতির পক্ষে প্রযোজ্য নয়। প্রাকৃতিক বা সামাজিক—সর্বপ্রকার পরিবেশকে মানুষ অতীতে প্রভাবিত করেছে, পরিবর্তিত করেছে। জীবন-বিজ্ঞানের নবলব্ধ জ্ঞান এই পরিবর্তনকে, এই প্রভাবনকে আরওসুনিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করবে বলে মনে করা অসঙ্গত নয়। কুলসংক্রমণ (heredity) তত্ত্বে মিচুরিণ ও আধুনিক বস্তুবাদী জীববিজ্ঞানীদের অবদান আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি। নিম্নপ্রাণী ও উদ্ভিদে অর্জিত গুণাবলীর কুলসংক্রমণ তত্ত্ব আজ সর্বজন-স্বীকৃত। হেরম্যান মুলার প্রমুখ কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ভয় পাচ্ছেন ; কারন, এঁদের মতে, বিবেচক, বুদ্ধিমান, সহৃদয় মানুষের প্রজননের হার বিপরীতধর্ম্মী ইতর মানুষের প্রজননের হারের চেয়ে কমে আসছে। বিশেষ কোনো দেশ বা সমাজব্যবস্থার পক্ষে হয়ত এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আফ্রিকা এশিয়ার বহুদেশ গেল কয়েক বছরে, স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং জনসাধারণের মানসিক উৎকর্ষসাধনের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিক্ষার প্রসার ঘটছে। সুশিক্ষাই সদ্‌গুণদায়ক —এ বিষয়ে সকলেই একমত। তাছাড়া, অভাব, অনটন, দারিদ্র্য, উৎপীড়নও এই সব দেশে কমে আসছে। ফলে মানবমনের সদ্‌গুণাবলীর অবশ্যম্ভাবী বিকাশ ঘটছে। এখনও পর্যন্ত মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিত হবার কারণ ঘটেনি। অন্যদিকে, ইডিয়ট ও নিউরোটিকে সংখ্যা বৃদ্ধির ভীতি ও অমূলক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই আতঙ্ক সম্বন্ধে এই সংখ্যার 'জনাতঙ্ক' প্রবন্ধে উল্লেখ আছে।

* * * *

নিউক্লিক এ্যাসিডের উপাদান পরিবর্তিত করে জীবকোষের গুণ পরিবর্তনে সক্ষম হয়েছে বিজ্ঞান। জীবকোষের প্রতিটির মধ্যেই কুলসংক্রমণ ধর্ম বর্তমান এবং কুলসংক্রমক জিনের উপাদান এক প্রকার নিউক্লিক এ্যাসিড। জিনের তড়িৎচুম্বক ধর্মের বৈশিষ্ট্যের উপর কুলসংক্রমণ নির্ভরশীল। পরিণাম ক্রিয়ার (metabolisn) পরিবর্তনে নিউক্লিক

এ্যাসিডের উপাদান বদলে যায় ও তড়িৎচুম্বক (electromagnetic) ধর্মের, তথা কুলসংক্রমণগুণের ও পরিবর্তন ঘটে। পরিকল্পিত সৌজাত্যবিদ্যার (Eugenics) প্রসার মানবজাতির কল্যাণময় ভবিষ্যতের সূচনা।

* * * *

মানব-মনের উৎকর্ষ-সাধনে মানুষের আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীক ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন-স্বীকৃত ; কিন্তু আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মানসিক উন্নয়ন ঘটবে—এ ধারণা ঠিক নয়। মানসিক উন্নয়নের একটি প্রধান শর্ত অবৈজ্ঞানিক ভাবধারা ও কুসংস্কারের অবলোপ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার সম্প্রসারণ সব সময়েই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার জনক নয়। পশ্চিমী দুনিয়ায়, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াকে উৎপাদনে নিয়োগ চলেছে অনেকদিন ধরেই। তা বলে কি পুরণো তত্ত্বকথা বা ভাবধারার বিলোপ ঘটেছে ? দিক্-পাল বিজ্ঞানীদের জীবন-দর্শনেই দেখা গেছে অবৈজ্ঞানিক প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা। বিশ্ব-প্রকৃতি বা সমাজকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জীন্স্, এডিংটন, হাইসেনবার্গ বিজ্ঞান সম্মত চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন অনেক সময়। বস্তুজগতের ব্যাখ্যায় অতীন্দ্রিয় শক্তির কল্পনা, অথবা অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানকে অস্বীকার—(এঁদের মত বিশ্ব-নন্দিত বিজ্ঞানীদের পক্ষে) আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, দ্বয়বাদ দর্শন (Dualistic Philosophy) হাজার হাজার বছর ধরে মানব-মনকে আচ্ছন্ন রেখেছে ; বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভংগী বা বৈজ্ঞানিক জীবনদর্শন তাই বিজ্ঞানীনেরও সহজায়ত্ত নয়। উপরন্তু, মস্তিষ্ক-বিজ্ঞান সম্মত মনোবিজ্ঞান,—অদ্বয়-বস্তুবাদের প্রধান স্তম্ভ—এখনও স্বল্প-পরিজ্ঞাত। বিশেষ ধরণের শিক্ষা ও প্রচার ছাড়া দ্বয়বাদের খণ্ডন সম্ভব নয়। বহুদিন প্রচলিত ধ্যানধারণার শক্তি কতখানি তা বোঝা যাবে হ্বাবী, কে, ওয়েলসের এই উক্তি থেকে ঃ—"Dualism—lip-service to mind as a function of the brain, while acting on the basis of its independence—it would appear still dominates, as Pavlov himself well knew, not only the popular mind but also the thinking of a great many scientists the world over."

* * * *

আত্মা ও মনসংক্রান্ত রহস্যবাদ আজ বৈজ্ঞানিক লেবেলযুক্ত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। বস্তু-নিষ্ঠ সত্যের (objective truth) হদিশ বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন নয়, বলছেন নিও-পজিটিভিষ্টরা। গোলাপের গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শ, আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানসাপেক্ষ ; কিন্তু গোলাপের অস্তিত্ব প্রমাণ বিজ্ঞানের এলাকাভুক্ত নয়, বলছেন এরা। এককথায়, এঁরা গোলাপের তথা বিশ্বপ্রকৃতির বাস্তব অস্তিত্বে সন্দিহান করতে চাইছেন আমাদের। স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে বাস্তব জগৎ তা হ'লে বস্তুবিযুক্ত হয়ে একটা 'আইডিয়া', বা 'স্পিরিটে' রূপান্তরিত হবে। যেহেতু ইলেক্টন, প্রোটোন, মেসন কণার অস্তিত্ব আলট্রা-মাইক্রসকোপেও সপ্রমাণ করা যায় না, শুধু ব্যবহার থেকে অনুমান করতে হয় ; সেহেতু এঁদের মতে,—এগুলোর অস্তিত্ব সন্দেহাতীত নয়। হাইসেনবার্গের কথায়—"Elementary particle is not material particle in space and time but, in a way, only a symbol on whose introduction the laws of nature assume an especially simple form" পরমাণু সম্বন্ধে যা সত্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে তাই সত্য হতে বাধ্য ! কেননা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আসলেত' কোটি কোটি পরমাণু-সমষ্টি মাত্র ! এইভাবে ভাববাদ-দর্শনকে বিজ্ঞানের লেবেল লাগিয়ে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা মানবতা-বিরোধী ! কেননা এই নিও পজিটিভিষ্টদের 'সেমান্টিক ভিত্তিক' তত্ত্বে 'ন্যায়-অন্যায়'. 'বিচার-অবিচার' 'সুনীতি দুর্নীতির' মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। সবই শুধু বাক্যের ঝঙ্কার, কথার ফুলঝুরি ! সবই সাবজেক্টিভ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক

কল্পনা ও অনুমান। বস্তুনিষ্ঠ অব্‌জেক্‌টিভ সত্য বলে কিছুরই অস্তিত্ব এঁরা স্বীকার করেন না। অথবা এমন কিছু স্বীকার করেন যা অতীন্দ্রিয়, সুতরাং অনিয়ন্ত্রনীয় ও অপরিকল্পনীয়।

নাগাসিকি হিরোসিমার অভিজ্ঞতার পর পরমাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীনতা অচিন্তনীয়। আইনষ্টাইনের ফর্মুলা দুর্জ্ঞেয় হলেও জানি, বস্তুর তেজে রূপান্তরন সম্ভব এবং আরও জানি সেই তেজ-বহ্নিতে পৃথিবীধ্বংসের সমূহ সম্ভাবনা! কাজেই বিচার-অবিচার, ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে নির্বিকার থাকা মানুষের পক্ষে অকল্পনীয় ও অন্যায়। মিথ্যা ধ্যানধারণা, কুসংস্কার, হিংসাদ্বেষইত্যাদি মুক্ত মানব-মন, পারস্পারিক প্রীতি-শ্রদ্ধায় ভাস্বর মানব-মন, বস্তুনিষ্ঠ-সত্য-ধৃত মানব-মন, যুক্তিবাদী মানব-মন, এই বিজ্ঞানের যুগে পরিকল্পনীয় ও সে-পরিকল্পনার রূপদান সম্ভাবনীয়। মানব-মনের সুপরিকল্পিত উন্নয়ন মানবজাতির মঙ্গলময় নিরাপদ ভবিষ্যৎ-গঠনের পক্ষে অপরিহার্য।

* * * *

আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পূর্বে ১৯৬১ সালে 'মানব মন' এর দুটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালী পাঠকদের সর্বজনবিদিত উন্নতরুচির পরিচয় দিয়েছে ঐ দুটি সংখ্যার চাহিদা। প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশের দশদিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। তার পর থেকে প্রথম সংখ্যাটি চেয়ে দুশোর বেশি পাঠক পত্র দিয়েছেন। অত্যন্ত দুঃখিত, আমরা এখনও তাঁদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হইনি। দ্বিতীয়টির [বিশেষ পাভলভ সংখ্যা] মুদ্রনসংখ্যা দ্বিগুন হওয়ায় এখনও কিছু সংখ্যক কাগজ আমাদের ভাণ্ডারে মজুত আছে; তবে জানুয়ারী মাসের মধ্যেই সেগুলি ও নিঃশেষিত হবে বলে মনে হয়। এই জনপ্রিয়তার মূলে আছে নগরীর বিশিষ্ট দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রগুলির সহৃদয় সমালোচনা ও এই নবজাতকের প্রতি তাঁদের আন্তরিক সহানুভূতি। বাঙলা দেশের সুরুচিসম্পন্ন প্রতিটি পাঠক ও বিশিষ্ট পত্রিকাগুলির সম্পাদকমণ্ডলীকে অজস্র ধন্যবাদ ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পেয়ে আমরা আনন্দিত।

SOVIET BOOKS & JOURNALS

Subscribe

Soviet Periodicals

	Subs. Rate for 1 yr.	Subs. Rate for 2 yrs.
SOVIET UNION (Pictorial monthly in English, Hindi, Urdu, Chinese etc.)	6.75	10.00
SOVIET WOMAN (Monthly in English, Hindi, Chinese etc.)	4.25	6.00
SOVIET FILM (Monthly in English)	6.75	10.00
CULTURE and LIFE (Monthly in English)	6.00	9.00
MOSCOW NEWS (Weekly in English)	8.00	12.00
NEW TIMES (Weekly in English)	6.00	9.00
INTERNATIONAL AFFAIRS (Monthly in English)	6.75	10.00
SOVIET LITERATURE (Monthly in English)	6.00	9.00

Gift

- A pictorial Calendar for 1962 to each and every Subscriber.

Books on Medical Science

F. ASRATYAN : I. Pavlov—Life & Works	0.75
L. ROKHLIN : Soviet Medicine in the Fight against Mental Diseases	0.44
K. PLATONOV : The Word as a Physiological and Therapeutic Factor	9.37
IVANOV-SMOLENSKY : Essays on the Pathophysiology of Higher Nervous Activity	2.87
K. BYKOV : The Cerebral Cortex and the Internal Organs	9.87
P. BULATOV : Modern Methods of Treating Bronchial Asthma	0.37

Just arrived

I. P. PAVLOV : Psychopathology and Pschiatry	8.19

MK BOOKS FROM U.S.S.R

V/O "MEZHDUNARODNAYA KNIGA"
MOSCOW, 200, USSR

NATIONAL BOOK AGENCY PRIVATE LTD.

12 BANKIM CHATTERJEE ST. CALCUTTA-12

172 Dharamtala Street, Cal-13

Nachan Road, Benachity, Durgapur-4